POSTAL REG NO GDP- 43 / 2026--2028

আল্লাহ্‌র বাণী

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُونُوا۟ قَوَّٰمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَـَٔانُ قَوْمٍ عَلَىٰٓ أَلَّا تَعْدِلُوا۟ ۚ ٱعْدِلُوا۟ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ

হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে ন্যায়পরায়ণতার উপর সাক্ষী হিসাবে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হও, এবং কোন জাতির শত্রুতা যেন তোমাদিগকে এই অপরাধ করিতে আদৌ প্ররোচিত না করে যে, তোমরা ন্যায়বিচার না কর। তোমরা সুবিচার কর, ইহা তাকওয়ার অধিকতর নিকটবর্তী। এবং আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর, নিশ্চয় তোমরা যে কাজকর্ম করিতেছ উহার সম্বন্ধে আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত। (আল মায়েদা: ৯)

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

খণ্ড 11

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

Weekly BADAR Qadian Bangla

সংখ্যা 18

সম্পাদক: তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক: মির্যা সফিউল আলাম

www.akhbarbadarqadian.in

বৃহস্পতিবার 30 Apr 2026 12 জুল কাআদা 1447 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর সুরক্ষার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হউক। আমীন।

রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর বাণী

সাহাবাগণের অতুলনীয় জীবন উৎসর্গীকরণ

হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, একবার আমার পিতার শাহাদাতের পর আমার সঙ্গে রাসূলুল্লাহ ?-এর সাক্ষাৎ হলো। তিনি বললেন, "হে জাবির! কী কারণে তুমি ভগ্নহৃদয় হয়ে বসে আছ? আমি আরয করলাম, "হে আল্লাহর রাসূল! আমার পিতা শাহাদাত বরণ করেছেন এবং তিনি তাঁর পেছনে পরিবার-পরিজন ও ঋণ রেখে গেছেন।" তিনি বললেন, "আমি কি তোমাকে সুসংবাদ দেব না, কীভাবে আল্লাহ তোমার পিতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন? আমি আরয করলাম, "জি হ্যাঁ, হুজুর! তিনি বললেন, "আল্লাহ কারও সঙ্গে কথা বলেননি, তবে পর্দার আড়াল থেকে। কিন্তু তোমার পিতাকে জীবিত করে তিনি তাঁর সঙ্গে সামনাসামনি কথা বলেছেন এবং বলেছেন, 'হে আমার বান্দা! তুমি আমার কাছে যা ইচ্ছা চাও, আমি তোমাকে তা দেব।' তিনি আরয করেছিলেন, "হে আমার প্রতিপালক! আমাকে আবার জীবিত করে দিন, যেন আমি পুনরায় আপনার পথে শহীদ হতে পারি।" (তিরমিযি, ২য় খণ্ড, কিতাবুত তফসীর)

পবিত্রভূমি 'সৎকর্মশীল'দের উত্তরাধিকার

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর পবিত্র বাণী

মানুষের জন্য অত্যাবশ্যক যে সে আল্লাহ তাআলার পথে নিজের জীবন উৎসর্গ করে। আমি কিছু পত্রিকায় পড়েছি যে অমুক আর্য তার জীবন আর্য সমাজের জন্য উৎসর্গ করেছে এবং অমুক পাদ্রি তার জীবন মিশনের জন্য উৎসর্গ করেছে। এতে আমার আশ্চর্য লাগে যে কেন মুসলমানরা ইসলামের খেদমতের জন্য এবং আল্লাহর পথে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করে না।

যদি কেউ মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর বরকতময় যুগের দিকে দৃষ্টি দেয়, তবে সে জানতে পারবে কীভাবে ইসলামের জীবন ও উন্নতির জন্য নিজেদের জীবন উৎসর্গ করা হতো। মনে রেখো, এটি ক্ষতির কোনো ব্যবসা নয়; বরং এটি অপরিমেয় লাভের একটি ব্যবসা। হায়! যদি মুসলমানরা বুঝতে পারত এবং সেই ব্যবসার লাভ ও উপকারিতা সম্পর্কে অবগত হতো-যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য এবং তাঁর দ্বীনের জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করে, সে কি তার জীবন হারায়? কখনোই না!

"তার জন্য তার প্রতিপালকের নিকট প্রতিদান রয়েছে, এবং তাদের ওপর কোনো ভয় থাকবে না, আর তারা দুঃখিতও হবে না।"

এই ইলাহী ওয়াক্?ফের প্রতিদান স্বয়ং তার প্রতিপালক প্রদান করেন। এই উৎসর্গই মানুষকে সব ধরনের চিন্তা ও দুঃখ-কষ্ট থেকে মুক্তি ও পরিত্রাণ দেয়।

আর আমার নিজের কথা বলতে গেলে, আমি যেহেতু এই পথের পূর্ণ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন, এবং শুধুমাত্র আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ ও দয়ার ফলে আমি এই স্বস্তি ও আনন্দ উপভোগ করেছি, তাই আমার এই আকাঙ্ক্ষা যে, যদি আমি মৃত্যুবরণ করি, তারপর আবার জীবিত হই, আবার মারা যাই এবং আবার জীবিত হই-তাহলে প্রতিবারই আল্লাহর পথে জীবন উৎসর্গ করার প্রতি আমার আগ্রহ আরও বেশি আনন্দের সাথে বৃদ্ধি পাবে।

অতএব, যেহেতু আমি নিজে অভিজ্ঞ এবং এ বিষয়ে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি, এবং আল্লাহ তাআলা আমাকে এই উৎসর্গের জন্য এমন এক উদ্দীপনা দান করেছেন যে, যদি আমাকে বলা হয় এই উৎসর্গে কোনো সওয়াব বা লাভ নেই, বরং এতে কষ্ট ও দুঃখই হবে, তবুও আমি ইসলামের খেদমত থেকে বিরত থাকতে পারি না।

[তফসীর হযরত মসীহ মওউদ (আ.) সূরা বাকারা]

যে ব্যক্তি নিজের সমগ্র জীবন ইবাদত ও দ্বীনের সেবায় উৎসর্গ করে না-সে কখনো আল্লাহর নৈকট্যের উচ্চ মর্যাদা অর্জনে সফল হয় না।

হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) সূরা বাকারার ১৫৪ নং আয়াত

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱسْتَعِينُوا۟ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوٰةِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّٰبِرِينَ এর ব্যাখ্যায় বলেন:

উপরোক্তভাবে ধৈর্য (সবর)-এর যে অর্থ বর্ণনা করা হয়েছে, সেই প্রেক্ষিতে এই আয়াতের অর্থ হলো-

(১) হে মুমিনগণ! যখন আল্লাহ তাআলার পথে তোমাদের উপর বিপদ ও কষ্ট আসে, তখন তোমরা বিচলিত হয়ো না এবং সে বিষয়ে অভিযোগও করো না।

(২) হে মুমিনগণ! যেসব বিষয় আল্লাহ তাআলার নৈকট্য লাভে বাধা সৃষ্টি করে, সেগুলো থেকে সর্বদা বাঁচার চেষ্টা করো।

(৩) হে মুমিনগণ! যখন তোমাদেরকে এমন বিধান দেওয়া হয় যার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার নৈকট্য অর্জিত হয়, তখন তা পালনে অলসতা প্রদর্শন করো না; বরং দৃঢ়তা ও নিয়মিততার সঙ্গে তা পালন করো।

এই তিনটি বিষয় আধ্যাত্মিক স্তর (মর্যাদা) অর্জনে সহায়ক। এগুলোকে সামনে রেখে চল। যদি তোমরা এভাবে চল, তবে তোমাদের সামনে যে কাজগুলো রয়েছে তা সম্পন্ন করতে তোমরা সফল হবে এবং তোমাদের লক্ষ্য অর্জিত হবে। একইভাবে, সালাত (নামাজ)-এর অর্থকে সামনে রেখে এই আয়াতের অর্থ হলো-

(১) হে মুমিনগণ! তোমরা নামাজের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার সাহায্য প্রার্থনা করো।

(২) হে মুমিনগণ! তোমরা দোয়ার মাধ্যমে তাঁর সাহায্য চাও।

(৩) হে মুমিনগণ! দ্বীনের উপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকার মাধ্যমে তাঁর সাহায্য লাভ করো।

(৪) হে মুমিনগণ! আল্লাহ তাআলার সৃষ্টির প্রতি দয়া ও সহানুভূতি প্রদর্শনের মাধ্যমে তাঁর সাহায্য লাভ করো।

(৫) হে মুমিনগণ! আল্লাহ তাআলার নিকট ইস্তিগফার করে এবং নিজের গুনাহসমূহের ক্ষমা চেয়ে তাঁর সাহায্য লাভ করো।

(৬) হে মুমিনগণ! আল্লাহর রাসূলের উপর দরূদ প্রেরণের মাধ্যমে তাঁর সাহায্য লাভ করো।

অতএব, এগুলো সবই আল্লাহ তাআলার সাহায্য ও সমর্থন লাভের উপায়।

সূরা ফাতিহায় শেখানো হয়েছে যে তোমরা বলবে: "ইয়্যাকা নাবুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্তাঈন-অর্থাৎ, আমরা কেবল তোমারই ইবাদত করি এবং তোমার কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করি। এখন এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে শিখিয়েছেন যে কীভাবে সেই সাহায্য অর্জন করা যায়। তিনি বলেন, এর উপায়গুলো হলো-

প্রথমত, দ্বীনের পথে আসা কষ্ট, বিপদ ও ত্যাগের কারণে বিচলিত হয়ো না।

দ্বিতীয়ত, যেসব বিষয় থেকে আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে নিষেধ করেছেন, সেগুলো থেকে বিরত থাকো।

তৃতীয়ত, আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য যে ত্যাগ প্রয়োজন, তা পরিত্যাগ করো না; বরং তা নিয়মিত ও দৃঢ়তার সঙ্গে পালন করো।

চতুর্থত, দোয়া করো যাতে আল্লাহ তাআলা তোমাদের ত্যাগকে উত্তম ফল দান করেন, তা কবুল করেন এবং তোমাদের বিজয় দান করেন।

পঞ্চমত, দরিদ্র ও অসহায়দের প্রতি সহানুভূতি ও দয়া প্রদর্শন করো, যাতে আল্লাহর সৃষ্টিকে আরাম দেওয়ার কারণে আল্লাহ তাআলাও তোমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন।

ষষ্ঠত, নিজের ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য সর্বদা আল্লাহ তাআলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকো।

(এরপর ৮ পাতায়....)

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

হিদায়ত প্রসারের পরিপূর্ণতার বরকতময় যুগ এবং ওয়াকফে জিন্দগী

প্রতিশ্রুত মসীহ (আ.) পবিত্র কুরআন ও বরকতময় হাদিসসমূহের আলোকে এবং আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে প্রাপ্ত ওহির ভিত্তিতে প্রমাণ করেছেন যে, হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রথম আবির্ভাব ছিল হেদায়েতের পূর্ণতার জন্য; আর তাঁর দ্বিতীয় আবির্ভাব, যা বুরূজি (রূপক) অর্থে নির্ধারিত ছিল এবং যার উল্লেখ সূরা আল-জুমআহ-তে রয়েছে, তা হেদায়েতের প্রচারের পূর্ণতার জন্য। এটাই সেই বরকতময় যুগ, যার মধ্যে আমরা অবস্থান করছি-এটি ইমাম মাহদি ও প্রতিশ্রুত মসীহের যুগ। হ্যাঁ, সেই যুগ, যার প্রতীক্ষায় উম্মতের বহু আউলিয়া ও আধ্যাত্মিক নেতৃবৃন্দ অপেক্ষা করে গেছেন।

প্রথম যুগে ইসলামের শত্রুরা তীর-তলোয়ার দ্বারা ইসলামের উপর আক্রমণ করত; কিন্তু বর্তমান আক্রমণ হচ্ছে কলম ও আধুনিক যোগাযোগমাধ্যমের মাধ্যমে। এই আধুনিক আক্রমণ থেকে ইসলামকে রক্ষা করা এবং তা সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে দিয়ে বিজয়ী করা-এটি ইমাম মাহদি (আ.)-এর জামাতের দায়িত্ব। হযরত মুহাম্মদ (সা.) স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছিলেন যে, প্রতিশ্রুত মসীহের যুগে তলোয়ারের জিহাদ বন্ধ হয়ে যাবে এবং ইসলামের বিজয় কেবল সুস্পষ্ট যুক্তি ও বিনয়পূর্ণ দোয়ার মাধ্যমেই প্রতিষ্ঠিত হবে।

প্রতিশ্রুত মসীহ (আ.) শুধু উপদেশই দেননি; বরং তিনি তাঁর জামাতের সদস্যদের ওপর এটিকে একপ্রকার বাধ্যতামূলক নির্দেশ (ওসিয়ত) হিসেবে আরোপ করেছেন যে তারা ইসলামের প্রচার ও প্রসারের জন্য নিজেদের জীবন উৎসর্গ করবে। তিনি বলেছেন:

"আমি আমার জামাতকে উপদেশ দেওয়া এবং এই কথা পৌঁছে দেওয়াকে নিজের দায়িত্ব মনে করি-তবে গ্রহণ করা বা অগ্রাহ্য করার বিষয়ে সে স্বাধীন-যে ব্যক্তি মুক্তি কামনা করে এবং পবিত্র ও চিরন্তন জীবনের আকাঙ্ক্ষা রাখে, সে যেন আল্লাহর জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করে এবং প্রত্যেকে চেষ্টা করে এমন একটি মর্যাদা অর্জন করতে, যাতে সে বলতে পারে: আমার জীবন, আমার মৃত্যু, আমার কুরবানি এবং আমার নামাজ-সবই আল্লাহর জন্য; এবং হযরত ইবরাহীমের ন্যায় তার আত্মা উচ্চারণ করে, 'আসলামতু লিরাব্বিল আলামীন' (আমি জগতসমূহের প্রতিপালকের কাছে আত্মসমর্পণ করেছি)। যতক্ষণ মানুষ আল্লাহর মধ্যে বিলীন না হয়, আল্লাহর জন্য মৃত্যু বরণ না করে, ততক্ষণ সে নতুন জীবন লাভ করতে পারে না। সুতরাং তোমরা যারা আমার সঙ্গে সম্পর্ক রাখো, নিজেদের মধ্যে দেখো-তোমাদের মধ্যে কতজন আমার এই কর্মকে নিজেদের জন্য গ্রহণ করতে প্রস্তুত এবং আল্লাহর জন্য জীবন উৎসর্গ করাকে প্রিয় মনে করে।"

(আল-হাকাম, খণ্ড ৪, সংখ্যা ২১, ৩১ আগস্ট ১৯০০, পৃষ্ঠা ৪)

জামাতের সদস্যদের মধ্যে জীবন উৎসর্গের চেতনা জাগ্রত করার জন্য এবং তাদেরকে ইসলামের বিজয়ের অভিযানে সম্পৃক্ত করার উদ্দেশ্যে, প্রতিশ্রুত মসীহ (আ.) ১৯০৬ সালে মাদ্রাসা আহমদিয়া প্রতিষ্ঠা করেন। এ উপলক্ষে তিনি বলেন:

"এই মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আমাদের উদ্দেশ্য একটাই-ধর্মকে দুনিয়ার ওপর অগ্রাধিকার দেওয়া। আমরা প্রচলিত শিক্ষাকে এজন্য সঙ্গে রেখেছি, যাতে এই জ্ঞানগুলো ধর্মের খেদমত করে। আমাদের উদ্দেশ্য এই নয় যে, মানুষ এফ.এ. বা বি.এ. পাশ করে জাগতিকতার খোঁজে ঘুরে বেড়াবে। বরং আমাদের লক্ষ্য এই যে, এমন মানুষ তৈরি করা, যারা ধর্মের সেবায় জীবন অতিবাহিত করবে; আর এই কারণেই আমি মাদ্রাসাকে অপরিহার্য মনে করি, যাতে তা ধর্মীয় সেবায় কাজে লাগে।" (মালফুযাত, খণ্ড ৮, পৃষ্ঠা ২৭৯-২৮০)

ধর্মের সেবার সুযোগকে প্রকৃত প্রশান্তি হিসেবে বর্ণনা করে তিনি বলেন:

"আমি নিজে এই পথের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন, এবং কেবল আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ ও ফজলের মাধ্যমে আমি এই স্বস্তি ও আনন্দ লাভ করেছি। আমার এই আকাঙ্ক্ষা যে, যদি আমি মৃত্যুর পর আবার জীবিত হই, তারপর আবার মৃত্যুবরণ করি এবং জীবিত হই-প্রতিবারই আল্লাহর পথে জীবন উৎসর্গ করার প্রতি আমার আগ্রহ আরও আনন্দের সঙ্গে বৃদ্ধি পাবে।"(মালফুযাত, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৩৭০)

প্রতিশ্রুত মসীহ (আ.)-এর এই আধ্যাত্মিক আহ্বানে জামাত প্রাণ ও মন দিয়ে সাড়া দিয়েছে, এবং গত শতাধিক বছরে হাজার হাজার নিবেদিতপ্রাণ ব্যক্তি নিজেদের জীবন উৎসর্গ করে ইসলামের প্রচারের পথে সর্বপ্রকার ত্যাগ স্বীকার করেছেন। এই জীবন উৎসর্গকারীরা জীবন, সম্পদ ও সময় উৎসর্গ করেছেন; তারা কথা ও লেখনীর মাধ্যমে দিন-রাত এক করে দিয়েছেন, এবং আজ তাদের নাম আহমদিয়াতের ইতিহাসে উজ্জ্বল মিনারের মতো জ্বলজ্বল করছে-যা আমরা গর্বের সঙ্গে স্মরণ করি। হযরত মাওলানা নূরুদ্দীন সাহেব (রা.), যিনি প্রতিশ্রুত মসীহ (আ.)-এর প্রথম খলিফা হন, তিনি তাঁর নির্দেশে কাদিয়ানে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন এবং নিজের জ্ঞান, সম্পদ ও সম্পত্তি আল্লাহর পথে উৎসর্গ করেন।

প্রতিশ্রুত মসীহ (আ.)-এর প্রতি তাঁর ভালোবাসা এবং ইসলামের সেবার প্রতি তাঁর উৎসাহ কত গভীর ছিল, তা তাঁর একটি চিঠি থেকে প্রতীয়মান হয়, যা তিনি প্রতিশ্রুত মসীহ (আ.)-কে লিখেছিলেন:

"মাওলানা, আমাদের মুরশিদ ও ইমাম, আপনার ওপর শান্তি, রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক। আমার দোয়া এই যে, আমি সর্বদা আপনার সান্নিধ্যে থাকতে পারি এবং যুগের ইমামের কাছ থেকে সেই উদ্দেশ্যসমূহ অর্জন করতে পারি, যার জন্য তাঁকে মুজাদ্দিদ করা হয়েছে। যদি অনুমতি হয়, তবে আমি চাকরি থেকে ইস্তফা দিয়ে দিন-রাত আপনার সেবায় নিয়োজিত থাকব; অথবা যদি আদেশ হয়, তবে আমি সব সম্পর্ক ত্যাগ করে দুনিয়ায় ঘুরে বেড়াব, মানুষকে সত্য ধর্মের দিকে আহ্বান করব এবং এ পথে জীবন উৎসর্গ করব। আমি আপনার পথে উৎসর্গিত; আমার যা কিছু আছে, তা আমার নয়-আপনার। হে আমার পথপ্রদর্শক ও গুরু, আমি আন্তরিকতার সঙ্গে নিবেদন করছি, যদি আমার সমস্ত ধন-সম্পদ ধর্ম প্রচারে ব্যয় হয়, তবে আমি আমার উদ্দেশ্য অর্জন করেছি।"

(ফতহে ইসলাম, রূহানি খাজাইন, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৩৬)

হযরত সাহেবজাদা আবদুল লতীফ শহীদ (রা.), যিনি প্রতিশ্রুত মসীহ (আ.)-এর আবির্ভাবের সংবাদ শুনে আফগানিস্তান থেকে কাদিয়ানে আসেন, তিনি সম্পূর্ণভাবে তাঁর প্রতি নিবেদিত হয়ে যান। আফগানিস্তানে ফিরে গিয়ে তিনি রাজার প্রদত্ত সম্মান ও মর্যাদা প্রত্যাখ্যান করেন এবং সকল প্রলোভন ও ভয় উপেক্ষা করে আল্লাহর পথে নিজের জীবন উৎসর্গ করেন এবং 'সাইয়্যিদুশ শুহাদা' উপাধিতে ভূষিত হন।

প্রতিশ্রুত মসীহ (আ.)-এর প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এই সাহাবীগণ কাদিয়ান থেকে বের হয়ে বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে ইসলামের প্রচারে ছড়িয়ে পড়েন। হযরত মুফতি মুহাম্মদ সাদিক সাহেব (রা.) আমেরিকায় যান; হাফিজ সুফি গোলাম মুহাম্মদ সাহেব মরিশাসে; হযরত মাওলানা আবদুর রহীম নায়্যার সাহেব (রা.) আফ্রিকায়; হযরত মাওলভী রহমত আলী সাহেব (রা.) প্রাচ্য দেশে; হযরত সৈয়দ জয়নুল আবেদীন ওয়ালিউল্লাহ শাহ সাহেব দামেস্ক ও ফিলিস্তিনে গমন করেন। অত্যন্ত প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যেও তারা বিশ্বব্যাপী ইসলামের প্রচারের দায়িত্ব পালন করেন। পরবর্তীতে খিলাফতে আহমদিয়ার নেতৃত্বে হাজার হাজার জীবন উৎসর্গকারী তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে ত্যাগ স্বীকার করেছেন। এর ফলস্বরূপ আজ বিশ্বের দুই শতাধিক দেশে ইসলামের বার্তা পৌঁছে গেছে। পবিত্র কুরআনের ৭৮টি ভাষায় অনুবাদ হয়েছে। হাজার হাজার মুবাল্লিগ দিন-রাত ইসলামের প্রচারে নিয়োজিত রয়েছেন, এবং এখন ওয়াক্ফে নও সদস্যরাও তাদের অবদান রাখছে। বিশ্বের বহু দেশে আধুনিক মুদ্রণযন্ত্রের মাধ্যমে ইসলামি বইপুস্তক প্রকাশিত হচ্ছে। বিভিন্ন দেশে জামিয়া (মিশনারি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যেখানে জীবন উৎসর্গকারীরা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে সারা বিশ্বে ইসলামের প্রচার করছেন।

এই জীবন উৎসর্গের যাত্রা কাদিয়ান ও ভারত থেকে শুরু হয়ে আজ সমগ্র বিশ্বে বিস্তৃত হয়েছে। আমরা ভারতের অধিবাসী হিসেবে এ বিষয়ে যতই গর্ব করি, ততই কম-কারণ আমরা সেই দেশে বাস করি, যেখানে প্রতিশ্রুত মসীহ (আ.) প্রেরিত হয়েছিলেন এবং এখান থেকেই এই আলো সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে। তবে এই মুহূর্তে আমাদের ঠাণ্ডা মাথায় নিজেদেরও পর্যালোচনা করা উচিত-এই ত্যাগের যাত্রায় আমাদের অংশ কতটুকু। খিলাফতে খামিসার এই যুগে জামাত বিশ্বব্যাপী দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে। আমাদের প্রত্যেককে, যারা ভারতে বসবাস করছি, চিন্তা করতে হবে-এই জীবন উৎসর্গের যাত্রায় আমরা কোথায় দাঁড়িয়ে আছি।

হযরত আমীরুল মুমিনীন (আ.) বলেছেন:

"তোমাদের মধ্যে যারা পনেরো বছর বা তার বেশি বয়সী, তারা এখন নিজেদের ভবিষ্যৎ ও ক্যারিয়ার নির্বাচনের বিষয়ে চিন্তা শুরু করবে। নিশ্চয়ই তোমরা সেই ক্ষেত্রগুলো বেছে নেবে, যেগুলো তোমাদের আগ্রহের বিষয়; তবে আমি তোমাদের অধিকাংশকে জোর দিয়ে বলব যে, জামিয়া আহমদিয়ায় ভর্তির জন্য আবেদন করার বিষয়টি বিবেচনা করো। কারণ বিশ্বব্যাপী আমাদের মুবাল্লিগদের তীব্র প্রয়োজন রয়েছে।"

(আল-ফজল ইন্টারন্যাশনাল, ১৯ আগস্ট ২০১৬)

তিনি আরও বলেন:

"ওয়াক্ফে নওদের মধ্যে জামিয়া আহমদিয়ায় যাওয়ার সংখ্যা আরও বেশি হওয়া উচিত। আমাদের সামনে পুরো বিশ্ব-এশিয়া, আফ্রিকা, ইউরোপ, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, দ্বীপপুঞ্জ-সব জায়গায় আমাদের পৌঁছাতে হবে। শুধু মহাদেশে নয়, শুধু দেশে নয়, শুধু শহরে নয়-বরং প্রতিটি জনপদে, প্রতিটি গ্রামে, বিশ্বের প্রতিটি মানুষের কাছে ইসলামের সুন্দর বার্তা পৌঁছে দিতে হবে। কয়েকজন মুবাল্লিগ দিয়ে এই কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব নয়।"

(জুমার খুতবা, ১৮ জানুয়ারি ২০১৩)

সুতরাং বিশেষভাবে ভারতের যুবসমাজ, বিশেষ করে ওয়াক্ফে নওদের, এই বরকতময় ও জীবনদায়ী জীবন উৎসর্গের ক্ষেত্রে এগিয়ে আসা প্রয়োজন। এর জন্য দৃঢ় সংকল্প ও শক্তিশালী আধ্যাত্মিক অনুপ্রেরণার পাশাপাশি দোয়ার সাহায্য নেওয়াও জরুরি-কারণ প্রতিশ্রুত মসীহ (আ.) বলেছেন যে, এখন ইসলামের এই বিজয় অর্জিত হবে উজ্জ্বল আধ্যাত্মিক যুক্তি ও দোয়ার মাধ্যমে। আল্লাহ আমাদের সবাইকে তৌফিক দিন, যেন আমরা প্রতিশ্রুত মসীহ (আ.)-এর প্রিয় জামাতে অন্তর্ভুক্ত হয়ে আমীরুল মুমিনীন-এর এই বরকতময় আহ্বানে সাড়া দিতে পারি। ওয়া বিল্লাহিত তাওফীক (সফলতা আল্লাহর কাছ থেকেই)।

জুমআর খুতবা

আমাদের কাজ তো এটিই যে, বিশেষভাবে মুসলিম বিশ্বের জন্য এবং নিরপরাধ মানুষের জন্য দোয়া করা। রমযান মাসে কেবল নিজের ব্যক্তিগত দোয়ার প্রতিই মনোযোগ না দিয়ে মুসলিম উম্মাহর জন্যও দোয়া করা উচিত। আল্লাহ তাআলা তাদেরকে প্রজ্ঞা দান করুন, যাতে পৃথিবীতে এবং বিশেষ করে মুসলিম বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। একজন মুসলমান যেন আরেক মুসলমানের গলা কাটার কারণ না হয়। যারা নিজেদের মধ্যে লড়াই করছে এবং অন্যায়ভাবে একে অপরকে হত্যা করছে, তারা আল্লাহ তাআলার অসন্তুষ্টির পাত্র হয়ে যাচ্ছে। এরা শুধু এই দুনিয়াতেই ক্ষতিগ্রস্ত নয়, বরং পরকালেও ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

অতএব, এই বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন এবং এর জন্য আমাদের বিশেষভাবে দোয়ার প্রয়োজন। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে প্রকৃত অর্থে দোয়া করার তাওফীক দান করুন।

হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যে বার্তা নিয়ে এসেছিলেন, তার উদ্দেশ্য ছিল এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা, তাঁর ইবাদত করা, তাঁর তাওহীদের প্রতিষ্ঠা করা, তাঁর জন্য চেষ্টা করা, তাঁর বান্দাদের হক আদায় করা এবং তারপর একটি ঐক্যবদ্ধ উম্মাহ হিসেবে পরস্পরের ভাই ভাই হয়ে বসবাস করা। কিন্তু আজ, আমরা কালিমা পাঠ করি এবং *লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ*-তে বিশ্বাস রাখার দাবি করা সত্ত্বেও আমাদের মধ্যে বিভেদ রয়েছে, ঐক্য নেই। আমাদের কাজকর্ম সেই শিক্ষার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়, যার অনুসরণের দাবি আমরা করি। ফলে, যদি আমরা বর্তমান মুসলিম বিশ্বের অবস্থার দিকে তাকাই, তবে তা অত্যন্ত উদ্বেগজনক।

মুসলিম সরকারসমূহ, রাজনীতিবিদগণ এবং রাজতন্ত্রগুলোর উচিত শুধু নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থ হাসিলের চেষ্টা না করে, বরং একটি ঐক্যবদ্ধ মুসলিম জাতি হওয়ার জন্য প্রচেষ্টা করা এবং এ উদ্দেশ্যে সর্বাত্মক চেষ্টা চালানো। তখনই তারা বিশ্বের আক্রমণ থেকে নিজেদের রক্ষা করতে পারবে। তখনই তারা নিজেদের মর্যাদা বজায় রাখতে পারবে এবং তখনই ইসলামবিরোধী শক্তিগুলোকে তাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করা থেকে রুখতে পারবে। এ জন্য আমাদের এটিও চিন্তা করা উচিত যে, এই যুগে আল্লাহ তাআলা কী ব্যবস্থা করেছেন। সেই ঐশী ব্যবস্থা কী, যা আমরা গ্রহণ করলে ও তার ওপর আমল করলে এসব অনিষ্ট থেকে বাঁচতে পারি এবং একটি ঐক্যবদ্ধ উম্মাহ হতে পারি? আল্লাহ তাআলার সেই ব্যবস্থা হলো, তিনি প্রতিশ্রুত মসীহকে প্রেরণ করেছেন, যাতে তিনি উম্মাহকে এক সম্প্রদায়ে পরিণত করেন।

আহমদী হিসেবে আমাদের একমাত্র চেষ্টা ও দোয়া হলো, আল্লাহ তাআলা যেন মুসলিম উম্মাহকে এক করেন এবং যে বিশৃঙ্খলা ও নির্যাতনের মধ্যে তারা আজ পিষ্ট হচ্ছে, তা থেকে তাদের রক্ষা করেন।

আমাদের এ দোয়াও করা উচিত যে, আল্লাহ তাআলা মুসলিম বিশ্বকে এই অশান্তি ও দুর্নীতি থেকে রক্ষা করুন এবং নিরাপদ রাখুন, আর মুসলমানরা যেন শান্তিপ্রিয় হয় এবং পরস্পরের ভাই ভাই হয়ে বসবাস করে। এটাই তাদের ইসলামী শিক্ষা, এটি নয় যে তারা একে অপরের গলা কাটবে।

এটাই আমাদের কাজ, এবং দীর্ঘদিন ধরে আমরা নিজেদের লোক ও অন্যদের উভয়কেই জুলুম থেকে বিরত রাখার জন্য সতর্ক করে আসছি, তাদের সাবধান করে আসছি। কারণ, যেভাবে এই জুলুম দিন দিন বাড়ছে, তাতে মনে হচ্ছে বৃহৎ পরিসরে বিশ্বযুদ্ধ আসন্ন। বরং কিছু পাশ্চাত্য বিশ্লেষকের মতে, বিশ্বযুদ্ধ ইতোমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে। আমিও বলি, তা শুরু হয়ে গেছে। কিন্তু এখনও যদি মুসলিম বিশ্ব প্রজ্ঞার সঙ্গে কাজ করে, সচেতন হয়, ঐক্যবদ্ধ হয় এবং একত্রিত হয়, তবে এখনও তারা দাজ্জালের ফিতনা থেকে রক্ষা পেতে পারে।

আমি দীর্ঘদিন ধরে মানুষকে এ বিষয়ে সতর্ক করে আসছি। যারা তখন আমার কথা শুনে বলত যে আমি পৃথিবী সম্পর্কে খুব হতাশাজনক কথা বলি, নেতিবাচক ধারণা পোষণ করি যে পৃথিবী ভয়াবহ যুদ্ধে জড়িয়ে পড়বে-আজ তারাই বলতে শুরু করেছে যে, কয়েক বছর আগে যাকে আমরা অসম্ভব মনে করতাম, আজ সেটিই সম্ভব হয়ে গেছে, এবং যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে।

এমন পরিস্থিতিতে মুসলিম বিশ্বের অত্যন্ত চিন্তাভাবনা করে পদক্ষেপ নেওয়া উচিত। কিন্তু আমরা আহমদীরা, যদিও তাদের জন্য বেদনা অনুভব করি, তবুও আমরা অসহায়। আমরা কিছুই করতে পারি না, শুধু তাদের সতর্ক করতে পারি, তাদের জন্য দোয়া করতে পারি এবং বোঝানোর চেষ্টা করতে পারি যে যা ঘটছে তা ভুল হচ্ছে। যদি মুসলিম সরকারগুলো এখনও বুঝে যায় এবং শুধু নিজেদের জাতীয় স্বার্থ নয়, বরং মুসলিম উম্মাহর স্বার্থকে সামনে রাখে এবং কোনো ধরনের বিশ্বাসঘাতকতা থেকে বিরত থাকে, তবে এখনও কিছুটা নিরাপত্তা অর্জন করা সম্ভব।

ইসলাম এসেছে তাওহীদের প্রতিষ্ঠার জন্য। অতএব, এ জন্য চেষ্টা করা উচিত। বড় শক্তিগুলোকে নিজের উপাস্য মনে করো না, কারণ চিরস্থায়ী শক্তি একমাত্র আল্লাহ তাআলার শক্তি। যদি এই বড় শক্তিগুলোকেই সবকিছু মনে করা হয়, তবে তারা ধীরে ধীরে সমগ্র মুসলিম বিশ্বের ওপর দখল করে নেবে এবং এই বাহ্যিক সরকারগুলোও শেষ হয়ে যাবে। অতএব, এখনও সময় আছে; জাগ্রত হওয়ার প্রয়োজন আছে। আল্লাহ তাআলার দিকে ফিরে আসো।

সৈয়্যদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের টিলফোর্ড স্থিত মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত ৬ ই মার্চ ফেব্রুয়ারী, ২০২৬, এর জুমুআর খুতবা (৬ই আমান, ১৪০৫ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ- بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ-

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ- الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ- مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ- اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ-

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ- صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ-

মহানবী (সা.) যে শিক্ষা নিয়ে এসেছেন তার মূল উদ্দেশ্য হলো- এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহ তা'লার প্রতি ঈমান আনয়ন করা, তাঁর ইবাদত করা, তাঁর তাওহীদ প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা চালানো, আল্লাহর বান্দাদের অধিকার আদায় করা এবং অভিন্ন জাতিসত্তা হিসেবে পরস্পর ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া। কিন্তু আজ আমরা মুখে কলেমা পাঠ করার এবং 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'- এই বিশ্বাস পোষণ করার দাবি করলেও বাস্তবে আমরা বহুধা বিভক্ত; আমাদের মাঝে কোন ঐক্য নেই। যে মহান শিক্ষার ধারক-বাহক হওয়ার দাবি আমরা করি, আমাদের কর্মের সাথে তার কোন মিল নেই। মুসলিম বিশ্বের বর্তমান গভীর উদ্বেগজনক অবস্থা এরই ফলাফল বৈ-কি।

অথচ অনেক মুসলিম দেশের প্রচুর প্রাকৃতিক সম্পদ ও বিত্ত বৈভব রয়েছে; তা সত্ত্বেও বিশ্বশক্তির দরবারে তাদের উল্লেখযোগ্য কোন মর্যাদা নেই। ধর্মের উন্নতির জন্য তাদের বিশেষ কোন ভূমিকা দেখা যায় না এবং ইসলামী আদর্শে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য যে ত্যাগ ও প্রচেষ্টা প্রয়োজন, তাও পরিলক্ষিত হয় না। এর ফলাফল অত্যন্ত স্পষ্ট– অন্যরা এই সুযোগকে কাজে লাগাচ্ছে। এ কথা আমি আগেও বহুবার বলেছি।

অতএব, মুসলিম সরকার, রাজনীতিবিদ ও রাজতন্ত্রগুলোর উচিত নিজেদের ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করার পরিবর্তে মিল্লাতে ইসলামিয়ার ঐক্য প্রতিষ্ঠায় সর্বাত্মক প্র চেষ্টা চালানো। তবেই আমরা বহিঃশক্তির আক্রমণ থেকে রক্ষা পাব, নিজেদের সম্মান-মর্যাদা পুনরুদ্ধার করতে পারব এবং ইসলাম-বিরোধী অপশক্তিগুলোকে আমাদের মাঝে বিভেদ সৃষ্টি করা থেকে বিরত রাখতে পারব। এ উদ্দেশ্যে আমাদের এটিও ভাবা উচিত যে, এই যুগে আল্লাহ তা'লা (উম্মতের কল্যাণে) কী ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। কোন সেই ঐশী ব্যবস্থা রয়েছে যার সাথে সম্পৃক্ত হলে বা যাকে গ্রহণ করলে আমরা বর্তমান বিপর্যয় থেকে রক্ষা পেয়ে একটি ঐক্যবদ্ধ উম্মতে পরিণত হতে পারি? সেই ঐশী ব্যবস্থা হলো– তিনি এই যুগে উম্মতের মাঝে ঐক্য সৃষ্টির জন্য প্রতিশ্রুত মসীহকে প্রেরণ করেছেন।সুতরাং আমাদের এ বিষয়ে গুরুত্বে র সাথে চিন্তা করা উচিত। ইসলামী দেশ ও সাধারণ মুসলমানরা যদি বিষয়টি নিয়ে ভাবেন, তবেই তারা নিজেদের বিরুদ্ধে মাথাচাড়া দেওয়া ষড়যন্ত্রমূলক নৈরাজ্য ও অশান্তি থেকে রক্ষা পাবেন। যাই হোক আহমদী আমাদের প্রচেষ্টা ও দোয়া হলো– আল্লাহ তা'লা মুসলিম উম্মাহকে ঐক্যবদ্ধ করুন এবং বর্তমানে তারা যে নৈরাজ্য ও অত্যাচারের যাঁতাকলে পিষ্ট হচ্ছে, তা থেকে তাদের রক্ষা করুন।

বিশ্ব পরিস্থি তি সম্পর্কে আমি দীর্ঘকাল ধরে সতর্ক করে আসছি। শুরুতে মনে করা হতো যে, কেবল ইউরোপ বা পশ্চিমা দেশগুলোই এই অস্থিরতার মূল কারণ। তারা অবশ্যই দায়ী, কিন্তু মুসলিম দেশগুলোও এর দায় এড়াতে পারে না। এ উদ্দেশ্যে পশ্চিমা শক্তিগুলো প্রথমে ইসলামী দেশগুলোতে অস্থিরতা-অশান্তি সৃষ্টি করেছে এরপর অগ্নিতে ঘৃত ঢেলে ধীরে ধীরে তা এক দেশ থেকে অন্য দেশে ছড়িয়ে দিয়েছে। এর নেপথ্যে তাদের ষড়যন্ত্র অত্যন্ত স্পষ্ট। তারা নিজেদের প্রভাব খাটিয়ে এসব দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ দখল ও নিয়ন্ত্রণ করতে চায় আর নিজেদের ব্যবহারাধীন আনতে চায়। আমি পূর্বে ই বলেছি অনেক আরব দেশের অগাধ ধন-সম্পদ থাকলেও পশ্চিমা শক্তিগুলো তাদের পদানত করে রেখেছে। যে কথাগুলো আমি বাইরের লোকদের ও আপনজনদের সামনে বলে আসছি আজ সেই দীর্ঘদিনের আশঙ্কাই বাস্তবে রূপ নিচ্ছে। আমাদের মনে রাখা উচিত, দাজ্জালী অশুভ শক্তিগুলো কখনোই মুসলমানদের শান্তি ও স্বস্তিতে দেখতে চায় না; মুসলিম বিশ্বে অস্থিরতা জিইয়ে রাখাই তাদের মূল এজেন্ডা। যে সব আরব দেশে তেল বা অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদ রয়েছে, পশ্চিমা শক্তিগুলো দীর্ঘকাল ধরে তাদের এই বলে ধোঁকা দিয়ে আসছে যে, আমরা শান্তি রক্ষার জন্য তোমাদের সাথে চুক্তি করছি। কিন্তু বাস্তবে তাদের অভ্যন্তরীণ পরিকল্পনা ছিল ভিন্ন, যা আজ দিবালোকের মতো স্পষ্ট।

তাই আজ আমাদের প্রধান কাজ হলো মহান আল্লাহর দরবারে বিশেষভাবে বিনীত হওয়া এবং মুসলিম বিশ্বের জন্য বিশেষভাবে দোয়া করা, এটি এখন যারপরনাই গুরুত্বপূর্ণ।

বর্তমানে মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধ পরিস্থিতি পর্যালোচনা করলে একটি বিষয় অত্যন্ত স্পষ্টভাবে সামনে আসে,তাহলো আমেরিকা অনেক মুসলিম দেশে সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করেছে। প্রশ্ন জাগে– কেন? এগুলো কি সত্যিই সেই দেশগুলোর নিরাপত্তার জন্য? এই আরব দেশগুলোর জন্য হুমকি আসলে কার পক্ষ থেকে ছিল? বাস্তবে এই অপশক্তিগুলো নিজেরাই ভীতিকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করে এক অলীক ধারণার জন্ম দিয়েছে যে, 'তোমরা বিপন্ন, তাই তোমাদের সুরক্ষার জন্য আমাদের সামরিক ঘাঁটি প্রয়োজন!' অথচ যাদের পক্ষ থেকে মুসলমানদের প্রকৃত আশঙ্কার কারণ থাকতে পারে, তাদের বিরুদ্ধে এই শক্তিগুলো কখনোই অস্ত্র ধরবে না। অথবা মুসলমানদের এই বলে প্রলুব্ধ করা হয়েছে যে, 'আমাদের ঘাঁটি স্থাপনের সুযোগ দিলে আমরা তোমাদের স্বার্থ রক্ষা করব এবং বাণিজ্যের পথ সুগম করে দেব।' প্রকৃতপক্ষে অত্রাঞ্চলে নিজেদের বিরোধী শক্তিগুলোর মোকাবিলায় নিজেদের উপস্থিতির দৃঢ় ভিত বজায় রাখাই ছিল তাদের মূল উদ্দেশ্য। আরব দেশগুলোর যদি কোন বিপদ থেকেও থাকে, তবে তা এই পরাশক্তিগুলোরই সৃষ্ট; অন্যথায় মুসলমানদের নিজেদের মধ্যে তেমন কোন গুরুতর সংঘাতের কারণ ছিল না। মূলত, এই পরাশক্তিগুলো এই অঞ্চলে নিজেদের আধিপত্য বজায় রাখার হীন উদ্দেশ্যে এসব ঘাঁটি স্থাপন করেছে। তারা মুসলিম ও অমুসলিম বিশ্বের ওপর নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব চাপিয়ে দিতে চায়। ইরান বরাবরই তাদের চক্ষুশূল, আর কিছু মুসলিম দেশও ধর্মীয় মতভেদের বাতাবরণে ইরানের বিরোধী– পরাশক্তিগুলো এই বিভেদকেই লুফে নিয়েছে। যেহেতু ইসরায়েলের বিরুদ্ধে ইরানের অবস্থান তুলনামূলকভাবে অনমনীয়, তাই তারা আরব দেশগুলোকে বশীভূত করে সেখানে সামরিক ঘাঁটি স্থাপনের ফন্দি আঁটে যাতে ইসরায়েলের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যায়। অধিকন্তু ইরানকে ভীতসন্ত্রস্ত রাখার জন্যও তাদের উপস্থিতি আবশ্যক। এর স্বাভাবিক ফলাফল আজ আমরা দেখতে পাচ্ছি– এসব ঘাঁটির উপস্থিতির কারণেই আরব দেশগুলোর ওপর হামলার আশঙ্কা ছিল, তা বাস্তবে রূপ নিয়েছে এবং তাদের অর্থনীতি ধ্বংস হয়ে গেছে। তেল সম্পদ ও পর্যটন খাতের ওপর এর মারাত্মক নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে।। এই পরিস্থিতিতে লাভবান হয়েছে মূলত ওই পরাশক্তিগুলোই আর ভবিষ্যতেও এই ধারা অব্যহত থাকবে। যখন যুদ্ধ হয় এবং অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তখন স্বাভাবিকভাবেই প্রতিপক্ষও পালটা আঘাত করে এবং অন্যদের ঘাঁটিগুলো ধ্বংস করার চেষ্টা করে। যেহেতু তারা ইরানের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে, তাই ইরানও সেটিই করেছে যা আজ আমরা দেখতে পাচ্ছি অর্থাৎ আরব দেশগুলোতে অবস্থিত আমেরিকান ঘাঁটিগুলোকে লক্ষ্যবস্তু বানিয়েছে এবং সেগুলো ধ্বংস করেছে অথবা ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। একজন আরব সাংবাদিক সম্প্রতি লিখেছেন যে, আরবদের সতর্ক থাকা উচিত; কারণ যেসব হামলা সম্পর্কে বলা হচ্ছে– ইরান করছে, তা বাস্তবে ইরান করছে না; এগুলো হয়তো আমেরিকা বা ইসরায়েল নিজেরাই ঘটাচ্ছে। শুরুতে ইরান কিছু হামলা করলেও, পরবর্তীতে সেই সুযোগ কাজে লাগিয়ে তারা নিজেরাও এমন নাশকতা করে থাকতে পারে। প্রকৃতপক্ষে কিছু হামলার দায় ইরান অস্বীকারও করেছে। সেই সাংবাদিক এমনও আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন যে, হতে পারে একসময় আমেরিকা ও ইসরায়েল এই যুদ্ধ থেকে নিজেদের হাত গুটিয়ে নেবে আর মুসলিম বিশ্ব নিজেদের মধ্যে লড়তে থাকবে– যা মূলত তাদের আকঙ্ক্ষা।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) ইরাক যুদ্ধের সময়ই সতর্ক করেছিলেন যে, এই বিশৃঙ্খলা বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়বে।(মধ্যপ্রাচ্য সংকট, পৃ: ২৯ ও ৭৬)

হায়! মুসলিম বিশ্ব যদি এটি উপলব্ধি করত!

পর্যালোচনা করে দেখুন, ইরাক যুদ্ধের পর এক এক করে অন্যান্য মুসলিম দেশেও অশান্তি ছড়িয়ে দেওয়ার অপচেষ্টা হয়েছে নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করা হয়েছে। (অর্থাৎ) অন্যান্য মুসলমান দেশেও ক্রমাগত অশান্তি দেখা দেয়, যা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। আমরা জানি আজ অনেক মুসলিম দেশ পরস্পরের বিরুদ্ধে লড়ছে। আমি যেভাবে বললাম এই অস্থিরতা পশ্চিমা বিশ্বেরই সৃষ্ট, যা থামারকোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না– একমাত্র আল্লাহ্ তা'লার বিশেষ নিয়তি প্রকাশ পেলে ভিন্ন কথা। তবে এর জন্য মুসলমানদের নিজেদেরও চেষ্টা করতে হবে। এর জন্য আমাদের সার্বক্ষণিক দোয়া করে যেতে হবে যেন আল্লাহ্ তা'লা মুসলিম বিশ্বকে এই অশান্তি ও নৈরাজ্য থেকে রক্ষা করেন এবং নিরাপদ রাখেন। মুসলিম বিশ্ব এবং মুসলমানদের উচিত, তারা যেন শান্তিপ্রিয়ভাবে ও পরস্পর ভাই ভাই হয়ে জীবন অতিবাহিত করে- এটাই ইসলামি শিক্ষা। তারা একে অন্যের রক্তপাত ঘটাবে এটি কাম্য নয়।

সুতরাং অন্যায়-অবিচার থেকে আপন-পর সবাইকে নিবৃত্ত রাখা এবং সতর্ক করাই আমাদের কাজ আর দীর্ঘকাল থেকে আমরা একাজ করে আসছি। বর্তমানে যেভাবে জুলুম বাড়ছে, তাতে মনে হচ্ছে একটি বড় আকারের বিশ্বযুদ্ধ আসন্ন। কোন কোন পশ্চিমা বিশ্লেষক তো বলছেনই যে বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে; আমিও মনে করি তা শুরু হয়ে গেছে। কিন্তু এখনও যদি মুসলিম বিশ্ব বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেয়, সচেতন হয়, ঐক্যবদ্ধ হয়ে যায় এবং পরস্পর সহমত হয়, তাহলে তারা এখনও দাজ্জালের নৈরাজ্য থেকে নিরাপদ থাকতে পারে।

বিশ্বে র পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে দেখুন! (বিশ্ব) এখন অনেক বড় বিপর্যয়ের সম্মুখীন । যেমনটি আমি আগেও বলেছি, প্র ত্যেকেই নিজ নিজ স্বার্থ চরিতার্থ করছে আর যখন চরম পর্যায়ের স্বার্থপরতা মাথায় ভর করে তখন মানুষ আর অন্য কিছু চিন্তা করে না, কেবল নিজেকে নিয়ে ভাবে। অতএব, আমাদের এটি দেখতে হবে, বিশ্বে যদি অশান্তি কমাতে হয় তবে কেবল নিজের অধিকার আদায় করে তা সম্ভব নয় বরং অধিকার প্রদান করতে হবে। মুসলিম বিশ্ব যদি এই বিষয়টি অনুধাবন করে তবে পশ্চিমা ও পরাশক্তিগুলোর মাঝে বিদ্যমান তাদের শুভাকাঙ্ক্ষীদের বলতে হবে যে, শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য তোমাদেরকেও

যুগ খলীফার বাণী

প্রত্যেক জীবই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করিবে। এবং নিশ্চয় কিয়ামতের দিনই কেবল তোমাদিগকে তোমাদের কর্মের পূর্ণ প্রতিদান দেওয়া হইবে। (আলে ইমরান: ১৮৬)

দোয়াপ্রার্থী: Humayun Kabir Molla, Nalhati, Birbhum

মহান আল্লাহ্‌র বাণী

হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা সুদ খাইও না যাহা (ধন-সম্পদ ও অনিষ্টকে) বহুগুণে বৃদ্ধি করে এবং আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর যেন তোমরা সফলকাম হইতে পার। (আলে ইমরান: ১৩১)

দোয়াপ্রার্থী: Azizur Rahaman Sb, Lalbag, Murshidabad

কিছু অধিকার ছাড়তে হবে। সত্যকথা হলো অধিকার ছাড়া দূরের কথা, তারা তো নিজেরাই অন্যদের অধিকার হরণ করছে। তাদেরকে এটি বোঝাতে হবে যে, তোমাদেরকেও ন্যায়নীতির পন্থা অনুসরণ করতে হবে, কেবল তবেই আমরা বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারব। এর জন্য আমি দীর্ঘকাল ধরে লোকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে আসছি–যেমনটি আমি পূর্বেই বলেছি,। যেসব লোক তখন আমার কথা শুনে বলত যে, 'আপনি বিশ্ব সম্পর্কে চরম হতাশাজনক কথা বলেন, নেতিবাচক ধারণা পোষণ করেন, বিশ্ব এক ভয়াবহ যুদ্ধে জড়িয়ে যাবে!'; আজ তারা নিজেরাই বলতে শুরু করেছে, কয়েক বছর আগেও যে বিষয়টিকে আমরা অসম্ভব বলে মনে করতাম, এখন সেই বিষয়টিই সম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে আর যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে।

আমেরিকা ও ইউরোপে বসবাসকারী তাদের নিজেদের বিশ্লেষকরাই এখন একথা লিখতে শুরু করেছে, বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গেছে, যেমনটি আমি পূর্বেই বলেছি আর এটি বাড়তেই থাকবে। যতক্ষণ পর্যন্ত এরা নিজেদের অন্যায় স্বার্থসিদ্ধির জন্য অপচেষ্টা অব্যহত রাখবে, ততক্ষণ এই আশঙ্কা হ্রাস পাওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। যুদ্ধে উভয় পক্ষেরই ক্ষয়ক্ষতি হয়ে থাকে। এখন মধ্যপ্রাচ্যে যে যুদ্ধ হচ্ছে, বাহ্যত এই যুদ্ধ আমেরিকার ইরানের ওপর হামলা করার মাধ্যমে শুরু করেছে; কিন্তু ইরান আগেই স্পষ্টভাবে হুঁশিয়ারি দিয়েছিল, আমাদের ওপর যদি হামলা হয়, তবে আরব দেশগুলোতে বিদ্যমান আমেরিকার সামরিক ঘাটিতে আমরা হামলা করব যা তারা কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে স্থাপন করেছে আর এখন সেই উদ্দেশ্য তারা চরিতার্থও করছে– ইরান পুন:পুন এটি স্পষ্ট করেছে। যুদ্ধ শুরু হলে ইরানের ওপর বোমাবর্ষণ করা হয়, তাদের শহরগুলোকে ধ্বংস ও বিধ্বস্ত করা হয়, নিরীহ জনগণ এবং শিশুদের হত্যা করা হয়,তাদের আধ্যাত্মিক নেতার বাসভবনে হামলা চালানো হয়, তাঁর পরিবারের অধিকাংশ সদস্যের প্রাণ হরণ করা হয়। এই অপশক্তিগুলোর ধারণা ছিল এবং তারা এই স্লোগান দিত যে, আমরা এই'রিজিম' বা শাসকগোষ্ঠীর পতন ঘটালে ইরানিরা স্বাধীনতা লাভ করবে ! কিন্তু (বাস্তবে) এর ফলাফল ভিন্ন প্রকাশ পেয়েছে। যারা কিছুটা বিরোধীতা করতো, তারাও এখন তাদের পক্ষে এসে গেছে। আর (তাদের মতে) তাদের নেতা খামেনাই সাহেব, শাহাদতের মর্যাদা লাভ করেছেন, আর একারণে জাতির কাছে তাঁর সম্মান আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। তাঁর সন্তানদের সহ পুরো পরিবারকে হত্যা করা হয়েছে। অতএব অন্যায় অবিচারের মাধ্যমে শাসক পরিবর্তনের পরিকল্পনা সফল হওয়া তো দূরের কথা, বরং তাদের মর্যাদা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে।

যাইহোক, ইরানও প্র তিক্রিয়া দেখিয়ে আরব দেশগুলোতে অবস্থিত পশ্চিমা ও আমেরিকান ঘাঁটিগুলোতে হামলা করেছে। এছাড়া তেলের খনিসমৃদ্ধ অঞ্চল বা এমন কিছু স্থানও রয়েছে, যেগুলোর ব্যাপারে আমেরিকা এই হুমকি দিতে আরম্ভ করে যে, ইরান যদি সৌদি আরবের অমুক তেলসমৃদ্ধ এলাকায় আক্রমণ করে, তাহলে আমরা কঠোর ব্যবস্থা নেবো। কিছু জায়গার সম্পর্কে বলেছেও যে, ইরান হামলা করেছে, তাই আমরা এই পালটা ব্যবস্থা নেব। এর উত্তরে ইরান স্পষ্ট করেছে, আমরা এমন জায়গায় কোন আক্রমণ করি নি আর আমাদের এমন হামলার পরিকল্পনাও নেই। মুসলমানদের হৃদয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ঘৃণা–বিদ্বেষ সৃষ্টি করার এটি আরেকটি ষড়যন্ত্র। যুদ্ধ তো আগে থেকেই হচ্ছে, এমন কথা বলে এই ঘৃণাকে কেবল আরও উসকে দেওয়ার–ই একটি অভিসন্ধি এটি। আমি পূর্বেই একজন সাংবাদিকের বিবৃতি উপস্থাপন করেছি, তিনি বলেছেন, হতে পারে, এরা নিজেরাই ক্ষতিসাধন করে ইরানের ওপর দোষ চাপিয়ে দেবে।যেমনটি আমি বলেছি, এমন পরিস্থিতিতে মুসলিম বিশ্বের অত্যন্ত সচেতন পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত। আহমদীরা অন্তরে ব্যথা থাকা সত্ত্বেও নিরুপায়, আমরা (আহমদীরা) অপারগ। কেবল তাদেরকে সতর্ক করতে পারি, তাদের জন্য দোয়া করতে পারি এবং এই কথাটি বোঝানোর চেষ্টা করতে পারি যে, যা হচ্ছে তা অন্যায় হচ্ছে। মুসলমান সরকারগুলো যদি এখনও বিষয়টি অনুধাবন করে, কেবল নিজেদের রাষ্ট্রীয় স্বার্থই না দেখে বরং মুসলিম উম্মতের স্বার্থ কে অগ্রগণ্য করে আর কোন প্রকার বিশ্বাসঘাতকতায় লিপ্ত না হয় তাহলে কিছুটা হলেও, রক্ষা পাওয়া সম্ভব।

মধ্যপ্রাচ্যের আরব দেশগুলোকেই নিন, যদিও তাদের কয়েকটির কাছে তো সম্পদ রয়েছে, কিন্তু না আছে তাদের প্রতিরক্ষামূলক সক্ষমতা , আর না তাদের শিল্পের বিকাশ ঘটছে। কেবল তেলের সম্পদ দিয়ে বা কোন কোন জায়গায় পর্যটন শিল্পের প্রসার ও উন্নয়ন ঘটানোর মাধ্যমে প্রকৃত উন্নতি সাধিত হতে পারে না। তারা শতভাগ নির্ভর করে পশ্চিমা বিশ্ব ও পশ্চিমা শক্তিগুলোর ওপর। যেমনটি আমি বলেছি, তাদের এই দুর্বলতার সুযোগকে লুফে নিয়ে পশ্চিমা শক্তিগুলো সেখানে নিজেদের (সামরিক) ঘাঁটি স্থাপন করেছে। এরপর যখন ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু হয়, তখন ইরানও আরব দেশগুলোর ওপর আক্রমণ করে। বাস্তবে আরব দেশগুলোর ওপর হামলা করে নি, বরং মার্কিন ঘাঁটিগুলোকে লক্ষ্য বানিয়েছে। কিন্তু এখন আরবদের এটি বুঝানো হচ্ছে যে,'তোমাদের ওপর হামলা করা হয়েছে'। এটি স্পষ্ট, এখন এই যুদ্ধ এক ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করেছে। ইরানের পক্ষ থেকে মিসাইল নিক্ষেপ করা হচ্ছে, সেগুলোকে ইন্টারসেপ্ট (বা মাঝপথে ধ্বংস) করার জন্য আমেরিকানরা নিজেদের একটি প্র তিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে বটে, কিন্তু বিশ্লেষকরা এখন একথা লিখছেন, ইরান যদি পঞ্চাশ হাজার ডলারের একটি মিসাইল নিক্ষেপ করে, সেটিকে অকেজো করতে যা ব্যয় হয় অর্থাৎ যে মিসাইলগুলো সেটি প্রতিহত করে তার মূল্য কয়েক মিলিয়ন ডলার। কোন কোন বিশ্লেষক লিখছেন যে, অর্থনৈতিক দিক থেকে এক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে আমেরিকা, কিন্তু এটি নিছক একটি ধারণা মাত্র। এই শক্তিগুলো আগে থেকেই প্রতিটি জিনিসের হিসাব কষে নেয় এবং পূর্ণাঙ্গ পর্যালোচনা করে। তারা পূর্ব থেকেই সবকিছু নির্ধারণ করে রেখেছে। আমি মনে করি না যে এরা নিজেরা এই ঘাটতি পূরণ করবে বরং তারা এই অর্থ আরব দেশগুলোর কাছ থেকেই এই অযুহাতে আদায় করবে যে, 'আমরা তোমাদের সুরক্ষা করছি'। একদিকে তাদের তেলের কূপগুলো বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং তেলের উৎপাদন হ্রাস পাচ্ছে; অন্যদিকে তাদের এই ক্ষতিও পূরণ করতে হবে। এর ফলে তাদের রিজার্ভ অনেক কমে যাবে বা ফুরিয়ে যাবে। শেষ পর্যন্ত আরব বিশ্বের অর্থ নীতি ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। পশ্চিমা পরাশক্তিগুলোরও কিছু ক্ষতি হলেও সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে আরব বিশ্ব। এই বিষয়টি তাদের এখনই বোঝা উচিত।

এখন আমরা দেখছি, আমেরিকার বর্তমান প্রেসিডেন্ট তাঁর পূর্ববর্তী সরকারগুলোর নীতিকেই বাস্ত বায়ন করছে। এটি কেবল বর্তমান সরকারের নীতি নয়; বরং তাদের নীতি সবসময় এটিই ছিল অর্থাৎ 'যেখানে মন চায় সেখানকার সম্পদ জবরদখল করে নাও এরপর সেটিকে বৈধতা দেওয়ার জন্য এ মর্মে (খোঁড়া) যুক্তি দাড় করাও যে, অমুক কারণে বা তমুক কারণে এটি করা হয়েছে। লজ্জাস্কর বিষয় হলো আমেরিকার বর্তমান ভাইস প্রেসিডেন্ট এটিও বলে বসেছেনযে অমুক দেশ যদি আমাদের সঙ্গে যোগ না দেয়, তবে আমরা জোরপূর্বক তাদের সম্পদ করতলগত করব এবং তাদেরকে আমাদের গ্যাঁংভুক্ত করে ছাড়ব। যেসব দেশ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে না, তাদের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়, স্যাংশন আরোপ করা হয়।

কিছুদিন পূর্বে স্পেনের প্রধানমন্ত্রী সাহসিকতার সঙ্গে বলেছিলেন– 'আমরা এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করব না এবং আমাদের বিমান ঘাঁটিও ব্যবহার করতে দেব না'। তখন তাকে হুমকি দিয়ে বলা হয়– 'আমেরিকা তোমাদের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিন্ন করবে'। এভাবে ভয়ভীতিদেখিয়ে ও অন্যায়ভাবে ক্ষতি করার চেষ্টা করে বিভিন্ন দেশ এবং দেশের মানুষকে তাদের দলে যোগ দিতে বাধ্য করা হয়। এভাবে যে ন্যায়নীতির কবর রচিত হয়। আর যখন ন্যায়বিচার থাকে না, তখন ধ্বংস নেমে আসে এবং এমন ভয়ংকর ফলাফল প্রকাশ পায় যা এখন দেখা যাচ্ছে; বরং এর চেয়েও ভয়াবহ ও ভীতিকর ফলাফল ভবিষ্যতে দেখা দেবে। কিছুদিন আগে ইউরোপীয় পার্লামেন্টে তাদের একজন স্পেনিশ নারী সাংসদ খুব স্পষ্টভাবে বক্তব্য দিয়ে বলেছেন– 'আমেরিকার কোন যুদ্ধের ফলে নারীরা কখনও স্বাধীনতা পায় নি'। তিনি একজন নারী হিসেবে নারীর দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টি উত্থাপন করেছেন। তিনি বলেন, এটি আমেরিকানদের একটি মিথ্যাসর্বস্ব দাবি যে আমরা ইরানের নারীস্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করছি। এর মাধ্যমে কখনও ইরানি নারীরা স্বাধীনতা পাবে না বরং আমেরিকা কখনও কোন নারীর স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করে নি এবং কাউকে স্বাধীনতা দিতেও সক্ষম হয় নি। যাহোক, সারকথা হলো, এই দেশগুলোতে যদিও আগে থেকেই বলা যায় আমেরিকার অনেকটা আধিপত্য ছিল, এখন এতে প্রকাশ্যে ইসরাঈলকে যুক্ত করে সেই আধিপত্যকে আরও সুদৃঢ় করা হচ্ছে।

আরব ও ইসলামী দেশগুলো একথা বুঝে না যে– বলপ্রয়োগ, ভয়ভীতি এবং দাজ্জালী কৌশলে আমাদের এমন এক জালে ফাঁশিয়ে দেওয়া হচ্ছে যেখানে আমরা নিজেরাই একটি মুসলিম দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবো। মুসলমানদেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়ানো হচ্ছে।

এখন রাশিয়া ও চীনও জোট গঠন করছে। আর এটি তো স্পষ্ট, যেসব জোট তৈরি হচ্ছে, ভবিষ্যতে এগুলো আরও বিস্তৃত হবে এবং এর অশুভ লক্ষণ প্রকাশ পেতে থাকবে এগুলো আরো দৃঢ়তা লাভ করবে। ইসলামী বিশ্ব এখন যুদ্ধক্ষেত্র , কারণ তাদের কাছে এমন সম্পদ রয়েছে যা এসব পরাশক্তি দখল করতে চায়। হায়! নরমুসলমানরা যদি এই বিষয়টি বুঝত এবং বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিত। আমেরিকা ও তার সহযোগী বলছে– ইরানের অমুক অভিসন্ধির একারণে আমরা তাদের হামলা করেছি। যদি সে এটি করত তবে এমনটি হয়ে যেত। পারমাণবিক বোমা তৈরি করে ফেলত বা অমুক ঘটনা ঘটে যেতো। শুধু একটি ধারণার ভিত্তিতে যুদ্ধ শুরু করে দেওয়া হয়েছে। এটি তো আদ্যোপান্ত একটি জবরদস্তিমূলক কথা। এখন তো খোদ পশ্চিমা বিশ্লেষকরাও বলতে শুরু করেছেন– ইরানকে ধ্বংস করা বা তার সঙ্গে যুদ্ধ করা এতটা সহজ নয়, যতটা তারা ভাবছিল। ইরান একটি বড় ও বিস্তীর্ণ দেশ। তারা কিছুটা হলেও শক্তি রাখে আর এই যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ীও হতে পারে। যদিও বৈশ্বিক অর্থনীতির ওপর এর প্রভাব পড়বে, কিন্তু মুসলিম বিশ্বের ওপর এর ক্ষতিকর প্রভাব হবে অনেক বেশি। সবচেয়ে দুঃখজনক বিষয় হল, এতে মুসলমানই মুসলমানের রক্ত ঝরাচ্ছে।

মুসলমানদের আল্লাহ্ তা'লার শাস্তির ভয় করা উচিত। শত শত শিশু হত্যা করা হয়েছে, শত শত নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করেছে। পশ্চিমা দেশগুলোতে অনেক কলাম লেখক এখন লিখছেন– ইসরাঈল, আমেরিকা বা অন্য কোন পশ্চিমা দেশে যদি আক্রমণ হয় এবং আমাদের কয়েকজন শিশু মারা যায়, তাহলে সংবাদপত্রে কলামের পর কলাম লেখা হয় এবং দিনের পর দিন লেখা অব্যাহত থাকে। কিন্তু এখানে (তথা ইরানে) একটি স্কুলে বোমা হামলা করে শত শত শিশুকে হত্যা করা হল, কিন্তু সেখানে টু শব্দটি করারও কেউ নেই। প্রথমে ফিলিস্তিনে এই ঘটনা ঘটিয়েছে আর এখন ইরানেও একই ঘটনা ঘটছে। মনে হয় যেন তাদের দৃষ্টিতে মুসলমানের জীবনের কোন মূল্যই নেই।

আল্লাহ্ তা'লা মুসলমানদের শুভবুদ্ধি দিন যাতে তারা বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেয় এবং পরস্পর মিলেমিশে বসে সমস্যাগুলো সমাধান করার চেষ্টা করে। তারা যেহেতু তাওহীদে বিশ্বাসী হওয়ার দাবি করে তাই তাদের উচিত তাওহীদ প্রতিষ্ঠার জন্য ঐক্যবদ্ধ হওয়া। অকারণে দোষারোপ করে ঝগড়া সৃষ্টি করার কোন প্রয়োজন নেই। শুধু এ কথা বলে দেওয়া যে, অমুকের বিশ্বাসের কারণে ঝগড়া বাড়ছে! এটি সঠিক যে অনেক সময় আকীদার কারণেও ঝগড়া হয়, মুসলমানদের মধ্যে পারস্পরিক যে দ্বন্দ্ব রয়েছে, তার পেছনে এটিও একটি কারণ; অথচ মহানবী (সা.) এত সতর্ক এবং এত দয়ার্দ্রচিত্ত ছিলেন যে, সাহাবীরা কখনও কখনও তাঁর সামনে বলতেন– অমুক ব্যক্তি মুনাফিক। তখন তিনি (সা.) বলতেন, যতক্ষণ সে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়ে, আমি তাকে কিছু বলতে পারি না এবং তোমরাও তাকে মুনাফিক বলো না।

(সহীহ বুখারী, কিতাবুস সলাত, হাদীস–৪২৫)

অতএব তুচ্ছ বিষয় নিয়ে ঝগড়া করা আসলে নিজেদেরই ক্ষতি করার নামান্তর। আল্লাহ্ তা'লা মুসলিম বিশ্বকে এক্ষেত্রেও বিবেক খাটানোর তৌফীক দিন। এখনও সময় আছে– তাদের বিষয়টি বুঝতে হবে। শুধু আকীদাগত মতভেদের কারণে ইরানের বিরোধীতা করা উচিত নয়। তাওহীদ প্রতিষ্ঠার জন্যই ইসলাম (পৃথিবীতে) এসেছে তাই তাওহীদের প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা উচিত। পরাশক্তিগুলোকে নিজেদের খোদা জ্ঞান করবেন না, কারণ চিরস্থায়ী ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ্ তা'লারই। এই পরাশক্তিগুলোকেই যদি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী মনে করা হয়, তাহলে এরা একে একে সমগ্র ইসলামী বিশ্বে নিজেদের দখল কায়েম করবে এবং নামেমাত্র যে সরকারগুলো রয়েছে, সেগুলোও হাতছাড়া হয়ে যাবে। অতএব এখনও সময় আছে, সচেতন হওয়া প্রয়োজন। আল্লাহ্ তা'লার কাছে বিনত হোন।

এসব জগৎপূজারী পৃথিবীর শান্তি ও স্থিতি বিশেষকরে মুসলিম বিশ্বের শান্তি ধ্বংস করেছে এবং ভবিষ্যতেও করবে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'লা মুসলমানদেরকে দিকনির্দেশনা দিয়ে বলেন:

وَإِنْ طَآئِفَتٰنِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوْا فَأَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا ۚ فَإِنْ بَغَتْ إِحْدٰىهُمَا عَلَى الْأُخْرٰى فَقَاتِلُوا الَّتِيْ تَبْغِيْ حَتّٰى تَفِيْٓءَ إِلٰٓى أَمْرِ اللّٰهِ ۚ فَإِنْ فَآءَتْ فَأَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوْا ۖ إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ–

(সূরা আল–হুজুরাত: ১০)

অর্থাৎ, যদি মুমিনদের দুটি দল পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধ করে, তবে তাদের মধ্যে সন্ধি স্থাপন করে দাও। সন্ধি হবার পর যদি তাদের মধ্যে একটি দল যদি অন্যটির ওপর আক্রমণ করে, তবে সবাই মিলে সেই আক্রমণকারী দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো–যতক্ষণ না সে আল্লাহ্ তা'লার আদেশের দিকে ফিরে আসে। এরপর যদি সে আল্লাহ্ তা'লার আদেশের দিকে ফিরে আসে, তাহলে ন্যায়ের সঙ্গে বিবদমান উভয় দলের মধ্যে মীমাংসা করো এবং ন্যায়বিচারকে সামনে রাখো। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'লা ন্যায়পরায়ণদের ভালবাসেন।

অতএব এটিই সেই চিত্র ও নীতি এবং দৃষ্টিভঙ্গি, যা পৃথিবীর শান্তির জন্যও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু বিশেষভাবে মুসলিম বিশ্বের এটি মেনে চলা উচিত কারণ পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'লা এই স্পষ্ট নির্দেশ তাদের প্রদান করেছেন।

তাই ন্যায় ও ইনসাফের দাবি পূর্ণ করুন। ইসলামী দেশগুলোর যে সংগঠন রয়েছে, তাদেরও এক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করা উচিত।

এটিও স্পষ্ট হওয়া উচিত– মীমাংসা করানোর সময় ব্যক্তিগত স্বার্থ সামনে রাখা যাবে না; বরং সমস্যার মূল কারণ কী– তা নির্ণয় করতে হবে। তবে বর্তমানে (সংঘাতের) কারণগুলো আমাদের সামনে স্পষ্ট আর তা হল, দাজ্জালী শক্তিগুলো আমাদেরকে লড়াতে চায়। জাতিসংঘ (ইউএন) ইত্যাদিসংস্থাগুলো কোন ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে নি। বরং এখন এরা নিজেরাই এর বিরুদ্ধে কথা বলতে শুরু করেছে। আমরা যদি ব্যক্তিগত স্বাথের উর্ধ্বে উঠে এবং নিজেদের জাতীয় স্বার্থের উর্ধ্বে গিয়ে কাজ করি, তবেই আমরা রক্ষা পাব। অন্যথায় আমরা এই দাজ্জালী শক্তিগুলোর ক্রীড়নকে পরিণত হবো। অতএব সব মুসলিম দেশের উচিত একত্রে বসে আলোচনা করা।

একইভাবে আল্লাহ্ তা'লা উক্ত আয়াতের পরবতী অংশে বলেন–

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوْا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ

(সূরা আল–হুজুরাত: ১১)

অর্থাৎ, মুমিনরা তো (পরস্পর) ভাই ভাই। অতএব তোমরা তোমাদের দুই ভাইয়ের মধ্যে– যারা পরস্পর বিবদমান– সন্ধি স্থাপন কর এবং আল্লাহ্ তা'লার তাকওয়া অবলম্বন করো, যাতে তোমাদের প্রতি কৃপা করা যায়।

মুসলমানদের মধ্যে মতানৈক্য দেখা দিলেও, যেমন বলা হয়– ইরান ও কিছু আরব দেশের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে, অথবা অন্য মুসলিম দেশগুলোর মধ্যেও মতভেদ রয়েছে; এমন ক্ষেত্রেও তাদের স্মরণ রাখা উচিত, তাদের পারস্পরিক মূল সম্পর্ক হল ইসলামী ভ্রাতৃত্ব ও সৌহার্দ্যের। ছোটখাটো (আকীদাগত) বিবাদ এই ইসলামী ভ্রাতৃত্ব পদদলিত করার কারণ হওয়া উচিত নয়। মুসলিম দেশগুলোর বিশেষভাবে এই বিষয়টির প্রতি মনোযোগ দেওয়া উচিত। অন্যথায়, যেমন আমি বলেছি– ইসলাম বিরোধী শক্তিগুলো এর সুযোগ গ্রহণ করবে।

অতএব আরব দেশগুলো ও ইরানের উচিত, তারা যেন শান্তিপূর্ণ সমাধানের পথ বের করে। চীন ও অন্য কিছু দেশ যাদের মধ্যে পাকিস্তানও রয়েছে, সমঝোতার উদ্দেশ্যে ভূমিকা রাখার প্রস্তাব দিয়েছে। হায়! মুসলিম বিশ্ব যদি এই বিষয়টি বুঝতে পারত! আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে বিবেক দান করুন।

যাইহোক, বিশেষভাবে মুসলিম বিশ্বের জন্য এবং নিরপরাধ লোকদের জন্য দোয়া করা আমাদের কর্তব্য। রমযান মাসে শুধু ব্যক্তিগত বিষয়ে দোয়া করবেন না বরং বিশেষভাবে সমগ্র মুসলিম উম্মাহর জন্যও দোয়া করুন। আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে বিবেক দান করুন, যাতে পৃথিবীতে এবং বিশেষ করে মুসলিম বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। মুসলমান যেন মুসলমানের রক্তপাত করা থেকে বিরত থাকে।এরা নিজেদের মাঝে যুদ্ধ করে, অন্যায়ভাবে একে অপরকে হত্যা করে আল্লাহ্ তা'লার ক্রোধের পাত্র হচ্ছে। এমন লোকেরা শুধু এই পৃথিবীতেই ক্ষতিগ্রস্ত হবে না, বরং পরকালেও ক্ষতিগ্রস্ত হবে। অতএব এই বিষয়টির প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন এবং এর জন্য আমাদের বিশেষভাবে দোয়া করা দরকার। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে প্রকৃত অর্থে দোয়া করার সৌভাগ্য দান করুন।

আজ আমি কিছু গায়েবানা জানাযার নামাজও পড়াবো।

কিছু মরহুম ব্যক্তির উল্লেখ করছি। প্রথম উল্লেখ হচ্ছে সম্মানিতা সাহেবজাদি আমাতুল জামিল সাহিবার, যিনি হযরত খলিফাতুল মসীহ দ্বিতীয় (রাযি.)–এর সর্বকনিষ্ঠ কন্যা এবং মরহুম নাসির মুহাম্মদ সিয়াল সাহেবের স্ত্রী ছিলেন। তিনি চৌধুরী ফতেহ মুহাম্মদ সিয়াল সাহেব (রাযি.)–এর পুত্রবধূ ছিলেন, যিনি এখানে মুবাল্লিগ হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি প্রায় উননব্বই (৮৯) বছর বয়সে কয়েকদিন আগে ইন্তেকাল করেছেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। মরহুমা মূসিয়া (ওসিয়্যতকারী) ছিলেন। তিনি হযরত সায়্যিদা মরিয়ম বেগম সাহেবা (রাযি.), উম্মে তাহিরের সর্বকনিষ্ঠ কন্যা এবং হযরত মুসলে মাউদ (রাযি.)–এর সন্তানদের মধ্যেও সর্বকনিষ্ঠ ছিলেন।

১৯৫৫ সালে হযরত মুসলে মাউদ (রাযি.) তার নিকাহ পড়ান। সে সময় তিনি অসুস্থ ছিলেন, তাই শয্যাশায়ী অবস্থায়ই খুতবা প্রদান করেন এবং দোয়া করান, যেখানে কেবলমাত্র কয়েকজন পারিবারিক সদস্য উপস্থিত ছিলেন। একজন বর্ণনাকারী লিখেছেন যে, পুরো অনুষ্ঠান জুড়ে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত হযরত খলিফাতুল মসীহ দ্বিতীয় (রাযি.)–এর উপর এক বিশেষ ভাবাবেগ বিরাজ করছিল। পরবতীতে ১৯৫৬ সালে হযরত মুসলে মাউদ (রাযি.) তার বিবাহের আয়োজন করেন এবং দোয়ার মাধ্যমে তাকে বিদায় দেন।

তার চারজন সন্তান রয়েছে: এক পুত্র, জাহির মুস্তাফা, যিনি তার জ্যেষ্ঠ সন্তান এবং যাকে তিনি তার বোন সাহেবজাদি আমাতুল কাইয়্যুম সাহিবার কাছে লালন–পালনের জন্য দিয়ে দেন। তার একটি কন্যা ইয়াসমিন মালিক, যিনি কানাডায় আছেন; সাদিয়া আহমদ, যিনি যুক্তরাজ্যে বসবাস করেন; এবং সোফিয়া আহমদ, যিনি রাবওয়ায় আছেন এবং নাযির খিদমতে দরবেশান মির্জা সামাদ আহমদের স্ত্রী। মরহুম নাসির মুহাম্মদ সিয়াল সাহেব ওয়াকফে–জিন্দেগি ছিলেন। হযরত মুসলে মাউদ (রাযি.) যখন ফজল–ই–উমর রিসার্চ ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করেন, তখন তাকে সেখানে গবেষণার কাজে নিয়োগ দেন। পরবতীতে যখন ইনস্টিটিউটটি বন্ধ হয়ে যায়, তখন জামাত তাকে নিজের কাজ করার অনুমতি দেয়।

তার কন্যা সোফিয়া লিখেছেন যে তিনি দরিদ্রদের প্রতি অত্যন্ত সহানুভূতিশীল ছিলেন। অন্যরাও লিখেছেন যে তিনি তাদের খোঁজখবর রাখতেন এবং প্রয়োজন পূরণের চেষ্টা করতেন। তার শৈশবের কিছু ঘটনা হযরত মুসলে মাউদ (রাযি.)–এর সঙ্গে সম্পর্কিত, এবং তার কিছু স্বপ্নেও তার উল্লেখ আছে। এভাবে তার উল্লেখের সঙ্গে কিছু প্রাচীন ইতিহাসও স্মরণে আসে।

তিনি নিজেই একটি পারিবারিক ঘটনা বর্ণনা করেছেন, যা হযরত মুসলে মাউদ (রাযি.)–এর নীতিনিষ্ঠা এবং জামাতের কর্মীদের সম্মানের প্রতি তার দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরে। তার জুতা বাইরে রাখা থাকত, যা একজন কর্মী পরিষ্কার করতেন। তিনি তার নিজের জুতাও সেখানে রেখে দেন। হযরত মুসলে মাউদ (রাযি.) জুতা হাতে নিয়ে জিজ্ঞাসা করেন, এগুলো কার? তিনি রাগান্বিত থাকায় কেউ কিছু বলেনি। পরে তিনি বলেন, "বল, কার জুতা–আমি কিছু বলব না।" যদিও তিনি তার খুব প্রিয় ছিলেন, তিনি বলেন, "এটা আমার।" তখন হযরত মুসলে মাউদ (রাযি.) বলেন, "ভবিষ্যতে যদি তুমি নিজে পরিষ্কার করতে না পারো, তাহলে আমাকে দিও, কিন্তু জামাতের কর্মীকে দিয়ে করিও না।" যাই

হোক, তিনি দানশীল ছিলেন এবং দরিদ্রদের খেয়াল রাখতেন। তিনি বলেন, তার পুরনো হিসাবপত্রে তিনি দেখেছেন যে নিয়মিত দরিদ্রদের সাহায্যের জন্য ব্যয়ের উল্লেখ ছিল।যখন তার বয়স সাত বছর, তখন তার মা উম্মে তাহির হযরত মরিয়ম সাহেবা (রাযি.) ইন্তেকাল করেন। হযরত মুসলেহ মাউদ (রাযি.) লিখেছেন: "যখন আমরা মরহুমাকে নিয়ে শেখ বশীর আহমদ সাহেবের বাড়িতে পৌঁছালাম, তখন আমি আমার ছোট মেয়ে আমাতুল জামিলকে দেখলাম, যে আমাদের উভয়েরই খুব প্রিয় এবং যার বয়স মাত্র সাত বছর, সে উচ্চস্বরে 'হায় আম্মি! হায় আম্মি!' বলে কাঁদছিল। আমি তার কাছে গিয়ে বললাম, 'জামি!' (আমরা তাকে স্নেহভরে জামি বলতাম)। আমি তাকে বললাম, 'তোমার মা আল্লাহর কাছে চলে গেছেন, সেখানে তিনি বেশি শান্তি পাবেন, এবং এটা আল্লাহরই ইচ্ছা ছিল। দেখো, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইন্তেকাল করেছেন, তোমার দাদা ইন্তেকাল করেছেন–তোমার মা কি তাদের চেয়ে বড় ছিলেন?'

এরপর হযরত মুসলে মাউদ (রাযি.) লিখেছেন: "আল্লাহর ছায়া যেন এই শিশুটির থেকে এক মুহূর্তের জন্যও বিচ্ছিন্ন না হয়। এই কথা শোনার পর সে আর কখনো তার মায়ের জন্য চিৎকার করেনি, বরং সঙ্গে সঙ্গেই সম্পূর্ণ শান্ত হয়ে যায়। বরং পরের দিন জানাজার সময়, যখন তার বড় বোন শোকে অজ্ঞান হয়ে যায়, তখন আমার জামি আমার ছোট স্ত্রী মরিয়ম সাদিকাহর কাছে গিয়ে বলে, 'ছোট আপ্পা' (শিশুরা তাকে ছোট আপা বলত) 'আপা এত বোকামি করছে কেন? আব্বা জান বলেন, আম্মার মৃত্যু আল্লাহর ইচ্ছায় হয়েছে, তারপরও সে কাঁদছে।'

এরপর হযরত মুসলে মাউদ (রাযি.) দোয়া করেন: "হে আমার প্রভু! হে আমার প্রভু! যার ছোট কন্যা তোমার সন্তুষ্টির জন্য মায়ের মৃত্যুর জন্য শোক করেনি, তুমি কি তাকে পরকালে সব দুঃখ থেকে রক্ষা করবে না?"তিনি হযরত মরিয়ম সাহেবা (রাযি.)–এর জন্যও দোয়া করেন: "হে আমার দয়ালু আল্লাহ! তোমার বান্দাদের এ ধরনের আশা রাখা তাদের অধিকার, এবং তা পূরণ করা তোমার শানের উপযুক্ত।"

যাই হোক, তিনি চাঁদা দেওয়ার ক্ষেত্রে অত্যন্ত নিয়মিত ছিলেন। ওসিয়্যতের চাঁদা এবং সম্পত্তির হিসাব তিনি আগে থেকেই সুশৃঙ্খলভাবে প্রস্তুত করে রেখেছিলেন। প্রতিবেশীদের মৃত্যু হলে তিনি নিয়মিত তাদের বাড়িতে খাবার পাঠাতেন। আগত অতিথিদেরও তিনি সবসময় বলতেন–আমাকেও তিনি বহুবার বলেছেন–"দোয়া করো যেন আমার পরিণতি ভালো হয়।"

তার নাতনি নুসরাত বলেন যে তার নানি নামাজের সময় হওয়ার আগেই প্রস্তুতি নিয়ে বসে থাকতেন এবং অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে সময়ের অপেক্ষা করতেন। তিনি দীর্ঘ ও আন্তরিক দোয়া করতেন, এমনকি যাদের জন্য দোয়া করবেন তাদের একটি তালিকাও তৈরি করে রেখেছিলেন। নুসরাত বলেন, তিনি যখন ছোট ছিলেন, তখন নানির দীর্ঘ ও কান্নাভেজা দোয়া শুনে ভয় পেতেন; কিন্তু তবুও তিনি সেইসব মানুষের জন্য দোয়া করতেন।

হযরত হাদি আলী সাহেব লিখেছেন যে, পূর্বে যেমন বলা হয়েছে, তার সঙ্গে কিছু পুরোনো স্মৃতি, ঘটনা এবং এমনকি হযরত মুসলে মাউদ (রাঃ)–এর কিছু স্বপ্নও জড়িত রয়েছে। এ প্রসঙ্গে হযরত হাদি আলী সাহেব বলেন, তিনি তাকে বলেছিলেন যে একবার তিনি হযরত খলিফাতুল মসীহ দ্বিতীয় (রাঃ)–এর সঙ্গে গাড়িতে ভ্রমণ করছিলেন এবং তার সঙ্গে পিছনের সিটে বসেছিলেন। তিনি লক্ষ্য করেন যে হযরত মুসলে মাউদ (রাঃ) বারবার আঙুলে কিছু গুনছেন। তখন তিনি জিজ্ঞেস করেন, "আব্বা জান! আপনি কী গুনছেন?"তিনি উত্তর দেন, "আমি পৃথিবীর সব দেশের মধ্যে আমার মুবাল্লিগদের সংখ্যা অনুমান করছি, এবং সারা বিশ্বে অন্তত এত লক্ষ মুবাল্লিগ প্রয়োজন; তাহলেই আমরা সমগ্র বিশ্বকে প্রকৃত ইসলামের সঙ্গে পরিচিত করতে পারব।" এটি হযরত মুসলে মাউদ (রাঃ)–এর গভীর উদ্দীপনা ও আকাঙ্ক্ষাকে প্রকাশ করে, এবং এ বিষয়ে বিভিন্ন বর্ণনাও রয়েছে।

এছাড়াও তার সঙ্গে সম্পর্কিত হযরত মুসলে মাউদ (রাঃ)–এর একটি স্বপ্ন রয়েছে, যা তার সঙ্গে সম্পর্ক থাকার কারণে এখানে উল্লেখ করা হলো। এই স্বপ্নটি ১৯৪৮ সালের জুন মাসের। তিনি বলেন যে জুন মাসে তিনি সিন্ধুর নাসিরাবাদে ছিলেন, যেখানে তিনি একটি অত্যন্ত উঁচু ও সাদা মিনার দেখেন, যা কাদিয়ানের মিনারের মতো আকৃতির ছিল। সেই মিনারের নিচের তলার বারান্দার দরজার কাছে তার কন্যা আমাতুল জামিল স্বাভাবিকভাবে বসে ছিলেন এবং বারান্দা থেকে পা ঝুলিয়ে রেখেছিলেন। এ সময় তার দৃষ্টি মিনারের দিকে পড়ে এবং তিনি দেখেন যে সর্বোচ্চ তলার দরজা থেকে একটি বিশাল সাপ–যা কয়েক গজ লম্বা এবং প্রায় দেড় ফুট মোটা, সবুজ রঙের–বের হয়ে নিচের তলার দিকে অগ্রসর হচ্ছে। সংক্ষেপে, সেটি নিচে নেমে আসে এবং আবার চলতে শুরু করে।

হযরত মুসলে মাউদ (রাঃ) বলেন যে তখন তার মনে এই চিন্তা আসে যে আমাতুল জামিল দরজার কাছে বারান্দায় বসে আছে, এবং তিনি ভয় পান যে সাপটি ফিরে গিয়ে তাকে দংশন করতে পারে। একই সঙ্গে তিনি এই ভয়ও করেন যে যদি মেয়েটি নড়ে, তাহলে সে পড়ে গিয়ে আঘাত পেতে পারে। তখন তিনি অত্যন্ত বিনয় ও আকুলতার সঙ্গে আল্লাহ তাআলার নিকট দোয়া করতে শুরু করেন। তিনি তার দোয়ার এই বাক্যটি স্মরণ করেন: اَللّٰهُمَّ اَعِذْهَا لِيْ وَلِلْجَمَاعَةِ الْاَحْمَدِيَّةِ وَلِغُرَبَائِهَا (হে আল্লাহ! তাকে আমার জন্য, জামাআতে আহমদিয়ার জন্য এবং এর প্রবাসীদের জন্য এই বিপদ থেকে রক্ষা করো)। তিনি ব্যাখ্যা করেন যে আরবিতে "গুরাবা "শব্দের অর্থ ভ্রমণকারী, আর উর্দুতে এর অর্থ দরিদ্র। আল্লাহই ভালো জানেন এখানে উর্দু না আরবি অর্থ প্রযোজ্য, এবং এতে কিছু ভ্রমণকারীর দিকেও ইঙ্গিত থাকতে পারে।

তিনি আরও বলেন, তিনি যখন দোয়া করতে থাকেন, তখন দেখেন যে আমাতুল জামিল নিজেই বিপদ অনুভব করে বারান্দা থেকে সরে যেতে শুরু করেন এবং ধীরে ধীরে কয়েক গজ দূরে সরে যান। এদিকে সাপটি দরজা দিয়ে নেমে এসে তার দিকে মুখ করে, কিন্তু সে কিছুটা দূরে থাকায় তাকে অনুসরণ না করে নিচের দিকে নেমে যায়।

তিনি লেখেন যে এই স্বপ্নটি আপাতদৃষ্টিতে শিশুটির জন্য অত্যন্ত মঙ্গলজনক, কারণ এতে দোয়া রয়েছে। এটি তার জন্য প্রশান্তির কারণ হওয়ার পাশাপাশি জামাত ও দরিদ্রদের জন্যও উপকারী হবে। আল্লাহই সর্বাধিক অবগত।

(রু'য়া ও কাশ্ফ সাইয়্যিদনা মাহমুদ, পৃষ্ঠা ৪১৬–৪১৭; এবং আল–ফযল, খণ্ড ২, সংখ্যা ২৮৭, ১৯ ডিসেম্বর ১৯৪৮, পৃষ্ঠা ৩ থেকে সংগৃহীত)

হযরত মুসলেহ মাউদ (রাঃ)–এর আরও কিছু স্বপ্ন রয়েছে, যেখানে তার উল্লেখ পাওয়া যায়। আল্লাহ তাআলা তার প্রতি ক্ষমা ও কৃপাসুলভ আচরণ করুন।

দ্বিতীয় যে জানাজার উল্লেখ করা হচ্ছে, তা হলো হল্যান্ডের ডা. রশীদ আহমদ খান সাহেবের। তিনি সম্মানিত নিজামুদ্দিন সাহেবের পুত্র ছিলেন। গত কয়েক দিন আগে তিনি একানব্বই (৯১) বছর বয়সে ইন্তেকাল করেছেন। *ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহে তিনি মোসি (ওসিয়তকারী) ছিলেন এবং তাঁর চার পুত্র ও চার কন্যা রয়েছে।

ডা. রশীদ সাহেবের পিতা নিজামুদ্দিন সাহেব ছিলেন সীমান্ত প্রদেশের (বর্তমান খাইবার পাখতুনখোয়া) সাবেক আমীর ডা. ফতেহ দীন সাহেবের ছোট ভাই। তাঁর মাধ্যমেই তাঁদের পরিবারে আহমদিয়্যাতের আগমন ঘটে। ১৯০৫ সালে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) লুধিয়ানায় একটি ভাষণ প্রদান করেন। সে সময় ডা. ফতেহ দীন সাহেব স্কুলে অধ্যয়নরত ছিলেন। স্কুলের শিক্ষকরা ছাত্রদের কঠোরভাবে নিষেধ করেছিলেন যে তারা যেন কখনো তাঁর বক্তব্য শুনতে না যায়, কারণ তিনি নাকি একজন জাদুকর এবং তোমাদের প্রভাবিত করে ফেলবেন–যে অভিযোগ সবসময় নবীদের বিরুদ্ধে আনা হয়ে থাকে, সেই একই অভিযোগ মৌলভীরা হযরত মসীহ মওউদ (আ.)–এর বিরুদ্ধেও করত।

তবুও ডা. ফতেহ দীন সাহেব তাঁর ভাষণ শুনতে যান এবং হযরত মসীহ মওউদ (আ.)–এর চেহারা দেখেই অল্প বয়সে নিশ্চিত হয়ে যান যে তিনি সত্যবাদী। পরবর্তীতে শিক্ষা সম্পন্ন করে ১৯১৪ সালে হযরত খলিফাতুল মসীহ প্রথম (রা.)–এর সময়ে গিয়ে তিনি বায়আত গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত নেক প্রকৃতির মানুষ। একইভাবে মরহুম ডা. রশীদ সাহেবও ছিলেন অত্যন্ত সৎ, নম্র স্বভাবের, মিশুক, খোদাভীরু এবং আত্মীয়স্বজনের প্রতি সদয়। তিনি অন্যদের জন্য নিজেকে কষ্টে ফেলতে প্রস্তুত থাকতেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত নির্ভীক ও সাহসী, খেলাফতের প্রতি গভীর অনুরাগী এবং সর্বদা যে কোনো ত্যাগের জন্য প্রস্তুত। তিনি গোপনে গরিবদের সাহায্য করতেন এবং অভাবগ্রস্তদের সহযোগিতা করতেন।

অনেক নববাইআতকারী ছিলেন, যাদের বিরুদ্ধে বিরোধীরা মিথ্যা মামলা দায়ের করত; তিনি তাদের জামিন দেওয়ার জন্যও এগিয়ে যেতেন। তিনি ফুরকান ফোর্সের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। তিনি এই সৌভাগ্যও অর্জন করেন যে, তাঁকে, তাঁর শ্বশুর আব্বাস খান সাহেবকে এবং তাঁর ভাই মনজুর সাহেবকে হযরত খলিফাতুল মসীহ দ্বিতীয় (রা.) ওয়াক্বেফ জাদীদের অধীনে সীমান্ত প্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পাঠান, যেখানে তাঁদের দায়িত্ব ছিল পুরনো আহমদী পরিবারগুলোর সাথে

যুগ খলীফার বাণী

যে ব্যক্তি পাপ পরিত্যাগ করে না এবং তার জিহ্বাকে সে মিথ্যা থেকে এবং তার অন্তরকে নাপাক খেয়াল ও অপবিত্র চিন্তা থেকে রক্ষা করে না তাকে এ জামাত থেকে কেটে দেয়া হবে। (রাযে হাকীকাত, পৃ: ১০)

দোয়াপ্রার্থী: Abdus Salam Master, Nararvita (Assam)

মহান আল্লাহ্‌র বাণী

সময় সংকীর্ণ এবং জীবনের কর্তব্য অনন্ত। দ্রুত চল, কারণ সন্ধ্যা আগত প্রায়। (আমাদের শিক্ষা, পৃ: ১৯)

দোয়াপ্রার্থী: Sk Imam Hossain sb, Khundanga, Bankura

যোগাযোগ পুনঃস্থাপন করা এবং তাবলিগের কাজ সম্পাদন করা। তিনি এই দায়িত্ব অত্যন্ত সুন্দরভাবে পালন করেন।

তাবলিগের প্রতি তাঁর গভীর আগ্রহ ছিল। তিনি তাঁর এক বন্ধু দৌলত খান সাহেবকে তাবলিগ করেন, ফলে তিনি বায়আত গ্রহণ করেন। এ কারণে তাঁর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হয়। ডা. রশীদ সাহেবের বিরুদ্ধেও মামলা হয় এবং তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। জামিনের জন্য কেউ এগিয়ে আসছিল না এবং মুচলেকাও গ্রহণ করা হচ্ছিল না। তখন রশীদ সাহেব নিজেই তাঁর জামাতাকে নিয়ে সেখানে যান। সেখানে প্রায় পাঁচ হাজার মৌলভীর একটি বিশাল জমায়েত ছিল, যারা তাঁদের উপর পাথর নিক্ষেপ শুরু করে। তাঁর জামাতার মাথায় পাথর লাগে, তিনি পড়ে যান, এরপর তাঁকে প্রহার করা হয় এবং শেষ পর্যন্ত তিনি সেখানেই শহীদ হন।

রশীদ সাহেবের বর্ণনা অনুযায়ী, পুলিশও সেই লাশকে লাথি মারতে শুরু করে, যেন তারাও "সওয়াব"অর্জন করছে। এরপর রশীদ সাহেবকেও নির্মমভাবে প্রহার করা হয় এবং তাঁর শরীরের প্রায় সব হাড়ই ভেঙে যায়। তিনি গুরুতর আঘাতপ্রাপ্ত হন। পরবর্তীতেও তাঁর শরীরে সেই আঘাতের চিহ্ন দেখা যেত- মুখে দাগ ছিল এবং হাত-পা বেঁকে গিয়েছিল, যা ঐ আঘাতের ফলেই হয়েছিল।

তবে আল্লাহ তাআলা তাঁকে রক্ষা করেন। তাঁকে এত মারধর করা হয় যে মৃত ভেবে ফেলে রাখা হয়। পরে পুলিশ তাঁর দেহ নিয়ে যাচ্ছিল। হাসপাতালে পৌঁছানোর কাছাকাছি এসে তিনি বলেন, "আমি জীবিত, আমাকে অমুক স্থানে পৌঁছে দিন।" ডাক্তাররা তাঁকে দেখে বিস্মিত হন যে তিনি কীভাবে জীবিত আছেন। কিন্তু আল্লাহ তাআলা তাঁকে জীবিত রাখারই ফয়সালা করেছিলেন। এত গুরুতর আঘাত সত্ত্বেও তিনি আরও ত্রিশ বছরেরও বেশি সময় জীবিত ছিলেন এবং অত্যন্ত সক্রিয় জীবন যাপন করেন।

তিনি পুলিশকে বলেন তাঁকে পেশোয়ারে পৌঁছে দিতে। যদিও পুলিশ বিরোধী ছিল এবং সেখানে পৌঁছানো কঠিন ছিল, তবুও কিছু অর্থ প্রদানের মাধ্যমে বিষয়টি সহজ হয়। তিনি বলেন, "তোমরা যা নেবে নিয়ে নাও, আমাকে পৌঁছে দাও।" অবশেষে একজন পুলিশ কর্মকর্তা এতে রাজি হন এবং তাঁকে পেশোয়ারে পৌঁছে দেন। পরে তিনি রাবওয়ায় আসেন, চিকিৎসা নেন এবং আল্লাহ তাআলার কৃপায় নতুন জীবন লাভ করেন। যেখানে তাঁকে মৃত ভেবে মর্গে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, সেখানে আল্লাহ তাঁকে আরও ত্রিশ বছর জীবিত রেখেছেন এবং সক্রিয় রেখেছেন। তিনি পরে হল্যান্ডেও বসবাস করেন এবং সেখানে জামাতের খেদমত করে যান।

১৯৭৪ সালেও তাঁর উপর শত্রুরা পিস্তল তাক করে। তখন মৌলভীরা তাঁকে বলে, "কালিমা পড়ো, মুসলমান হয়ে যাও।" তিনি জবাব দেন, "আমি তো আগেই *লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ' পড়ি-এটাই আমার ঈমান; আমি আবার কীভাবে মুসলমান হব?"তারা বলে, "না, মির্জা সাহেবকে গালাগালি করো।" তিনি বলেন, "আমি গালাগালি করব না-এটি ইসলাম নয়।" এরপর তিনি বলেন যে তিনি দরুদ পড়েন এবং মহানবী (সা.)-এর শিক্ষা অনুসরণ করেন, তাই তিনি এ ধরনের কাজ করতে পারেন না।

তিনি আরও বলেন যে তিনি তাদের এক সাহাবীর ঘটনা শুনিয়েছিলেন- উহুদের যুদ্ধে যখন মহানবী (সা.)-এর শাহাদতের খবর ছড়িয়ে পড়ে, তখন এক সাহাবী বলেন, তাঁর এবং জান্নাতের মধ্যে শুধু একটি খেজুর বাধা, সেটি সরিয়ে রেখে তিনি একাই শত্রুর দিকে ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং শহীদ হন। রশীদ সাহেব বলেন, "তোমাদের আর আমার মাঝে তো সেই খেজুরটিও নেই, কারণ তোমরা আমার বুকে বন্দুক ধরে রেখেছ। তোমরা গুলি করো এবং আমাকে শহীদ করো, কিন্তু তোমরা যা বলতে বলছ, তা আমি বলব না।"

এইভাবে তিনি অসাধারণ সাহসের পরিচয় দেন। আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রতি মাগফিরাত ও রহমত করুন, তাঁর মর্যাদা উন্নত করুন এবং তাঁর সন্তানদেরও নেক কাজ অব্যাহত রাখার তৌফিক দান করুন।

তৃতীয় যে উল্লেখ, তা হলো সম্মানিতা জয়নব বিবি সাহিবার, যিনি মরহুম বশীর আহমদ সাহেব-সাবেক সদর জামাত এবং চক ২৭৫ কার্তারপুর মসজিদের ইমামের স্ত্রী ছিলেন। কয়েক দিন আগে তিনি পঁচাশি (৮৫) বছর বয়সে ইন্তেকাল করেছেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহে তিনি মোসিয়া ছিলেন। তাঁর পিতা আলী মুহাম্মদ সাহেব ছিলেন ফয়সালাবাদের দারুয-যিকর মসজিদের খাদিম।

তিনি ছিলেন অত্যন্ত দোয়াকারী, তাহাজ্জুদগুজার, নামাজে নিয়মিত, প্রতিদিন পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতকারী, অতিথিপরায়ণ, খেলাফতের প্রতি গভীর অনুরাগী এবং নেক স্বভাবের একজন মহিলা। তিনি দরিদ্রদের সাহায্য করতেন এবং নিয়মিতভাবে জুমার খুতবা শুনতেন, ঘরের সদস্যদের একত্র করে তা শোনাতেন।

তাঁর পেছনে তিন পুত্র ও চার কন্যা রয়েছেন। তাঁর অনেক নাতি-নাতনি ওয়াক্ফে জীবন। তাঁর কন্যা আমাতুর রশীদ সাহিবা, যিনি তাহির আহমদ সাইফি সাহেবের স্ত্রী-তিনি জামাতের একজন মুবাল্লিগ এবং জাম্বিয়ার লুসাকায় খেদমত করছেন। মায়ের ইন্তেকালের সময় তিনি লুসাকায় অবস্থান করছিলেন, ফলে তিনি জানাজায় অংশ নিতে পারেননি বা শেষবারের মতো মাকে দেখতে পারেননি। আল্লাহ তাআলা তাঁকে ধৈর্য ও সাহস দান করুন এবং মরহুমার প্রতি মাগফিরাত ও রহমত নাযিল করুন।

(প্রকাশিত: আল-ফজল ইন্টারন্যাশনাল, ২৭ মার্চ ২০২৬)

জামিয়া আহমদিয়া কাদিয়ানে ভর্তি বিজ্ঞপ্তি

জামিয়া আহমদিয়া কাদিয়ান হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর প্রতিষ্ঠিত সেই পবিত্র প্রতিষ্ঠান, যেখান থেকে এখন পর্যন্ত শত শত আলেম ও মুবাল্লিগ স্নাতক হয়ে বিশ্বের নানা প্রান্তে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব পালন করছেন। সাইয়্যেদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ (আয়্যাদাহুল্লাহু তা'আলা বিনাসরিহিল আজীজ)ও বহুবার আহমদী ছাত্রদের এই পবিত্র দ্বীনি প্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে জামাআতের সেবায় আত্মনিয়োগ করার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

অতএব, হযূরের নির্দেশনার আলোকে অধিক সংখ্যক ওয়াক্ফে নও এবং অনওয়াক্?ফে নও ছাত্রদের উচিত জামিয়া আহমদিয়ায় ভর্তি হয়ে দ্বীনি শিক্ষা অর্জন করা এবং জামাআতের সেবার জন্য নিজেদেরকে পেশ করা।

হযূর (আয়্যাদাহুল্লাহু তা'আলা বিনাসরিহিল আজীজ)-এর অনুমোদনক্রমে এ বছর জামিয়া আহমদিয়ায় ১লা এপ্রিল থেকে 'সাত বছর মেয়াদি মুরব্বি কোর্স, শর্ট টার্ম মুয়াল্লিম কোর্স এবং মাদরাসাতুল হিফয'-এর জন্য ভর্তি কার্যক্রম শুরু হবে।

অতএব, যেসব ছাত্রের ম্যাট্রিক বা উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষাসমূহ সম্পন্ন হয়েছে এবং যারা জামিয়া আহমদিয়া বা শর্ট টার্ম মুয়াল্লিম কোর্সে ভর্তি হতে ইচ্ছুক, তারা 'শাখা ওয়াক্ফে নও ভারত' অথবা 'নাযারত তালীম'-এর সাথে যোগাযোগ করুন এবং যত দ্রুত সম্ভব জামিয়া আহমদিয়ার ভর্তি ফরম পূরণ করে 'দফতর ওয়াক্ফে নও ভারত (নাযারত তালীম)'-এ পাঠিয়ে দিন।

ভর্তির জন্য নিম্নোক্ত শর্তাবলি রয়েছে:

(১)ম্যাট্রিক পাস ছাত্রের জন্য বয়সসীমা ১৭ বছর এবং উচ্চমাধ্যমিক পাস ছাত্রের জন্য ১৯ বছর। হাফেজ ছাত্রদের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে বয়সসীমায় শিথিলতা দেওয়া যেতে পারে।

(২) জামিয়া আহমদিয়ায় ভর্তির জন্য 'ন্যাশনাল ক্যারিয়ার প্ল্যানিং কমিটি ওয়াক্ফে নও ভারত' ছাত্রদের সাক্ষাৎকার ও লিখিত পরীক্ষা গ্রহণ করবে এবং জামিয়ার জন্য নির্বাচন করবে। লিখিত পরীক্ষায় কুরআন মাজীদ, ইসলাম, আহমদিয়াত, দ্বীনি জ্ঞান, উর্দু, ইংরেজি এবং সাধারণ জ্ঞান সম্পর্কিত প্রশ্ন থাকবে।

(৩) লিখিত পরীক্ষা ও সাক্ষাৎকারে উত্তীর্ণ ছাত্রদের নূর হাসপাতাল কাদিয়ান থেকে মেডিকেল টেস্ট নেওয়া হবে। লিখিত পরীক্ষা, সাক্ষাৎকার ও মেডিকেল টেস্টে উত্তীর্ণছাত্রদের হযূরের অনুমোদনক্রমে জামিয়া আহমদিয়ায় ভর্তি দেওয়া হবে।

(৪)একইভাবে বিবাহিত ও গ্র্যাজুয়েট বন্ধুদের জন্য শর্ট টার্ম মুয়াল্লিম কোর্সের মেয়াদ আড়াই বছর নির্ধারিত, যাতে দুই বছর (২৪ মাস) শিক্ষা কার্যক্রম এবং ৬ মাস প্রশিক্ষণ অন্তর্ভুক্ত। অন্যদিকে মাধ্যমিক /উচ্চমাধ্যমিক পাস এবং আন্ডারগ্র্যাজুয়েটদের জন্য মুয়াল্লিম কোর্সের মেয়াদ সাড়ে তিন বছর নির্ধারিত, যাতে ৩ বছর শিক্ষা কার্যক্রম এবং ৬ মাস প্রশিক্ষণ অন্তর্ভুক্ত।

(৫) ডাকযোগে ভর্তি ফরম সংগ্রহের জন্য ঠিকানা:

qdnwaqfenau@gmail.com

WAQF-E-NAU DEPARTMENT (NAZARAT TALEEM)

Darul Balagh,CIVIL LINE,QADIAN

DISTRICT:GURDASPUR,PUNJAB(INDIA) PIN:143516

CONTACT:01872-500975

সপ্তমত, নবীগণের উপর দরুদ পাঠ করো, কারণ তাদের মাধ্যমেই তোমরা আল্লাহ তাআলার কাছে পৌঁছানোর তাওফিক পেয়েছ।
অষ্টমত, আল্লাহ তাআলার দ্বীনের উপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকার চেষ্টা করো।
নবমত, ইবাদতের উপর দৃঢ়ভাবে অটল থাকো।
এই সমস্ত বিষয়কে আল্লাহ তাআলা সাফল্য অর্জনের উপায় হিসেবে বর্ণনা করেছেন। অতএব, যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার সাহায্য ও সমর্থন পেতে চায়, তার জন্য এই নয়টি বিষয়ে আমল করা অপরিহার্য।
কেবল মুখে "হে আল্লাহ! আমাকে সাহায্য করো-এ কথা বলা কোনো অর্থ বহন করে না। সাহায্য লাভ করতে হলে প্রথমে এই উপায়গুলোর উপর আমল করা জরুরি। যে ব্যক্তি বিচলিত হয়ে হতাশ হয়ে পড়ে, অথচ আশা করে যে আল্লাহর ফেরেশতারা আকাশ থেকে নেমে এসে তাকে সাহায্য করবে-সে কখনোই সেই সাহায্য লাভে সফল হয় না। যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার আদেশ অমান্য করে, অথচ আশা করে যে ফেরেশতারা তার সাহায্যের জন্য অবতীর্ণ হবে-সে কখনো সফল হয় না। যে ব্যক্তি ত্যাগ স্বীকারে দ্বিধা করে এবং আল্লাহ প্রদত্ত দায়িত্ব পালন করতে ব্যর্থ হয়-সে কখনো সফল হয় না। যে ব্যক্তি দোয়া করে না, আল্লাহর সামনে বিনীতভাবে কাঁদে না, অথচ তাঁর অলৌকিক সাহায্যের আশা করে-সে কখনো সফল হয় না। যে ব্যক্তি দ্বীনের ব্যাপারে উদাসীন এবং তার উন্নতিতে সহায়ক নয়-সে কখনো শত্রুদের মোকাবেলায় সফল হয় না। যে ব্যক্তি দরিদ্র ও অভাবগ্রস্তদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করে না এবং তাদের কষ্ট লাঘবে সাহায্য করে না-সে নিজের বিপদের সময় আল্লাহর সাহায্য লাভে কখনো সফল হয় না। যে ব্যক্তি আল্লাহর রাসূলদের উপর দরুদ পাঠ করে না, তাদের জন্য দোয়া করে না এবং তাদের অনুগ্রহের প্রতি কৃতজ্ঞতার অনুভূতি নিজের অন্তরে ধারণ করে না-সে কখনো আল্লাহর সাহায্য লাভে সফল হয় না। আর যে ব্যক্তি নিজের সমগ্র জীবন ইবাদত ও দ্বীনের সেবায় উৎসর্গ করে না-সে কখনো আল্লাহর নৈকট্যের উচ্চ মর্যাদা অর্জনে সফল হয় না। (তফসীরে কবীর, তফসীর সুরাতুল বাকারা,পৃ: ২৮৫-২৮৬)

সফর বৃত্তান্ত (অস্ট্রেলিয়া, ২০১৩)

কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সাথে হুযূর-এ-আনোয়ার (আ)-এর বৈঠক

নির্ধারিত কর্মসূচি অনুযায়ী সন্ধ্যা ছয়টায় হুযূর-এ-আনোয়ার (আই.) "মসজিদ বায়তুল হুদা-তে আগমন করেন এবং কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের সাথে তাঁর এই প্রোগ্রাম শুরু হয়।

প্রোগ্রামটি পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে শুরু হয়, যা তিলাওয়াত করেন আজিজ মুবারক আহমদ বিন আবদুল্লাহ এবং এর ইংরেজি অনুবাদ উপস্থাপন করেন জনাব ফায়েক জান খান।

এরপর মাননীয় সরফরাজ রহিম সাহেব (ন্যাশনাল সেক্রেটারি এডুকেশন) একটি প্রারম্ভিক প্রতিবেদন পেশ করে জানান যে:

* প্রাইমারি স্কুলে আমাদের শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৪০৪, যার মধ্যে ২০৩ আতফাল এবং ২০১ নাসিরাত।

* সেকেন্ডারি স্কুলে শিক্ষার্থী ও সদস্যের সংখ্যা ৩৩২, যার মধ্যে ৫৮ আতফাল, ৯৯ খুদ্দাম, ৬২ নাসিরাত, ২৩ আনসার এবং ৯০ লাজনা রয়েছে। (এই আনসার ও লাজনা ভাষা শেখা বা ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য কোর্স করছে।)

* TAFE শিক্ষার্থীদের বিবরণ অনুযায়ী, ৯৬ জন ছাত্র এবং ৬৬ জন ছাত্রী, মোট ১৬২ জন।

* ব্যাচেলর/অনার্স পর্যায়ে ১০৬ জন ছাত্র এবং ১১৩ জন ছাত্রী রয়েছে।

* বর্তমানে ৫১ জন ছাত্র এবং ২৬ জন ছাত্রী মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করছে, মোট ৭৭ জন।

* বর্তমানে ৬ জন ছাত্র এবং ৯ জন ছাত্রী বিভিন্ন বিষয়ে পিএইচডি করছে।

এইভাবে অস্ট্রেলিয়ার বিভিন্ন স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত আহমদী শিক্ষার্থীদের মোট সংখ্যা ১,২০৯।

হুযূর-এ-আনোয়ার (আই.) বলেন, আপনাদের মোট তাজনীদের (৪,০০০ নিবন্ধিত সদস্য) ৩২% অংশই শিক্ষার্থী।

ন্যাশনাল সেক্রেটারি এডুকেশন আরও জানান যে, এই মুহূর্তে এখানে ৫৫ জন শিক্ষার্থী উপস্থিত রয়েছে, যার মধ্যে ৩৯ জন ব্যাচেলর, ১৪ জন মাস্টার্স এবং ২ জন পিএইচডি করছে। এ কথা শুনে হুযূর বলেন: আল্লাহ তা'আলা সবাইকে সফলতা দান করুন।

এরপর কর্মসূচি অনুযায়ী জনাব তারিক চৌহান তাঁর গবেষণা 'স্কিজোফ্রেনিয়ার পরিবেশগত ও জিনগত কারণ' শীর্ষক বিষয়ে উপস্থাপন করেন।

তিনি ব্যাখ্যা করেন যে স্কিজোফ্রেনিয়া একটি রোগ যা বিশ্বের প্রায় এক শতাংশ মানুষের মধ্যে দেখা যায়। এই রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি বিভিন্ন অশ্রুত শব্দ শুনতে পায় এবং কখনও কখনও অদৃশ্য জিনিসও দেখতে পায়। এটি স্মৃতিশক্তির উপরও প্রভাব ফেলে। সাধারণত এটি তরুণদের মধ্যে শুরু হয়। এর সঠিক কারণ এখনো জানা যায়নি এবং এর জন্য কার্যকর কোনো চিকিৎসাও নেই।

তিনি আরও বলেন যে বর্তমান গবেষণায় দেখা যাচ্ছে, পরিবেশগত কারণ যেমন শৈশবে মাথায় আঘাত, মানসিক চাপ (স্ট্রেস), ভুল ওষুধের অতিরিক্ত ব্যবহার-এছাড়াও Neuregulin (NRG1) এই রোগের সম্ভাব্য কারণ হতে পারে। আরও গবেষণার মাধ্যমে এমন ওষুধ তৈরি করা সম্ভব হতে পারে যা এই জিনকে নিয়ন্ত্রণ করে রোগটি প্রতিরোধ করতে সক্ষম হবে।

হুযূর-এ-আনোয়ার (আই.) এই গবেষণা সম্পর্কে বিভিন্ন প্রশ্ন করেন।

এরপর ডা. আব্রার আহমদ তাঁর গবেষণা "শ্বাসতন্ত্রের সংক্রমণ প্রতিরোধ এবং ফেসমাস্কের ভূমিকা' শীর্ষক বিষয়ে উপস্থাপন করেন।

তিনি ব্যাখ্যা করেন কীভাবে শ্বাসতন্ত্রের রোগ প্রতিরোধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়। তিনি বলেন, বক্ষসংক্রান্ত সংক্রমণ বিশ্বে মৃত্যুর তৃতীয় প্রধান কারণ এবং দরিদ্র দেশগুলোতে এটি মৃত্যুর সবচেয়ে বড় কারণ। এসব রোগের মধ্যে সাধারণ সর্দি-কাশি ও ফ্লু অন্তর্ভুক্ত। বিশ্বব্যাপী ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়া রোগগুলোর মধ্যে "স্প্যানিশ ফ্লু"এবং যক্ষ্মা উল্লেখযোগ্য।

যদিও অনেক ভ্যাকসিন ও ওষুধ এসব রোগ থেকে সুরক্ষা দেয়, তবুও হাত পরিষ্কার রাখা, ফেসমাস্ক ব্যবহার, গ্লাভস, বিশেষ চশমা ব্যবহার এবং রোগীকে অন্যদের থেকে আলাদা রাখা-এসব ব্যবস্থাও প্রতিরোধে অত্যন্ত কার্যকর।

তিনি আরও বলেন যে বর্তমান গবেষণায় শক্ত প্রমাণ পাওয়া গেছে যে বিভিন্ন ধরনের ফেসমাস্ক, বিশেষ করে দরিদ্র দেশগুলোতে, এসব রোগ প্রতিরোধে কার্যকর।

হুযূর-এ-আনোয়ার (আল্লাহ তা'আলা তাঁর সহায় হোন) বলেন: সর্দির শুরুতেই যদি অপড়হরঃব ১০০০ ঢ়ড়ঃবহপু-এর এক ডোজ নেওয়া হয়, তাহলে প্রায় পঞ্চাশ শতাংশ আরাম পাওয়া যায়।

হুযূর আরও বলেন: বড় সমাবেশও সর্দি-কাশির কারণ হতে পারে।

হুযূর আরও মন্তব্য করেন: আপনার গবেষণার শেষ ফলাফল যেন এই দিকে যাচ্ছে যে কোন ফেসমাস্ক বেশি উপকারী এবং কীভাবে মাস্ক প্রস্তুতকারীরা বেশি লাভ করতে পারে।

হুযূর পরামর্শ দেন যে, যেমন বিভিন্ন স্থান থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে, তেমনিভাবে ফজল-এ-উমর হাসপাতাল, রবওয়া থেকেও তথ্য সংগ্রহ করা উচিত, যা এখন স্টুডেন্ট ট্রেনিং হাসপাতাল, রবওয়ার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

হুযূর আরও বলেন: আমি ঘানায় ছিলাম। প্রথম এক বছর কখনো কুইনিন খাইনি, এবং আমার ম্যালেরিয়া হয়নি। যখন আমার স্ত্রী এলেন এবং তিনি ওষুধ নিলেন, তখন আমিও নিলাম এবং তখন আমার ম্যালেরিয়া জ্বর হলো। যখন নিইনি, তখন হয়নি।

উপস্থাপক ব্যাখ্যা করেন যে বিভিন্ন ধরনের ফেসমাস্ক যা তৈরি করা হচ্ছে, তা শুধু ডাক্তার ও প্যারামেডিক্যাল স্টাফদের জন্য নয়, বরং রোগী এবং সাধারণ মানুষের জন্যও।

হুযূর-এ-আনোয়ারের সাথে শিক্ষার্থীদের এই প্রোগ্রাম সন্ধ্যা সাতটা পর্যন্ত চলতে থাকে।

এরপর কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের সাথে হুযূর-এ-আনোয়ার (আল্লাহ তা'আলা তাঁর সহায় হোন)-এর প্রোগ্রাম শুরু হয়।

কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের সাথে হুযূর-এ-আনোয়ার-এর বৈঠক

প্রোগ্রামটি পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে শুরু হয়, যা তিলাওয়াত করেন আজিজা ফারাহ খান এবং তিনি এর উর্দু অনুবাদও উপস্থাপন করেন।

এরপর তাহিরা ইয়াসমিন সাহিবা, ন্যাশনাল সেক্রেটারি এডুকেশন (লাজনা অস্ট্রেলিয়া), একটি প্রারম্ভিক প্রতিবেদন পেশ করেন।

এরপর পিএইচডি অধ্যয়নরত দুইজন ছাত্রী তাদের নিজ নিজ প্রেজেন্টেশন উপস্থাপন করেন।

আজিজা আয়েশা আবদুল মজিদ "দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার মিডল স্কুল শিক্ষার্থীদের গণিতে অর্জনের উপর প্রভাব বিস্তারকারী কারণসমূহ' শীর্ষক বিষয়ে তাঁর গবেষণা উপস্থাপন করেন। তিনি ব্যাখ্যা করেন যে অস্ট্রেলিয়ায় সাউথ অস্ট্রেলিয়া সরকার শিক্ষার্থীদের ন্যাশনাল অ্যাসেসমেন্ট প্রোগ্রামের অধীনে একটি জরিপ পরিচালনা করে। এই জরিপে শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের মধ্যে সম্পর্ক বিশ্লেষণ করা হয় এবং এর ফলাফল তুলনা করা হয়। এই ফলাফলের ভিত্তিতে স্কুলগুলোকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করা হয়:

১। ক্যাথলিক স্কুল, ২। সরকারি স্কুল, ৩। বেসরকারি স্কুল

এই জরিপ অনুযায়ী, শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের মধ্যে সুসম্পর্ক থাকার কারণে ক্যাথলিক স্কুলগুলোতে ভালো ফলাফল দেখা গেছে। শুধু শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে ভালো যোগাযোগই নয়, বরং গণিতে অভিভাবকদের প্রচেষ্টা, শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব, দক্ষ শিক্ষক এবং ব্যবহারিক শিক্ষাও ভালো ফলাফলে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

এরপর আজিজা বুশরা নাসিম "ইকো-হাইড্রোলজিক্যাল মডেল ডেভেলপমেন্ট শীর্ষক প্রেজেন্টেশন উপস্থাপন করেন। ইকো-হাইড্রোলজি বিজ্ঞানের একটি নতুন শাখা।

তিনি তাঁর গবেষণায় ব্যাখ্যা করেন যে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার কারণে পানিসম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার বর্তমান সময়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজন হয়ে উঠেছে।

ইকো-হাইড্রোলজি এমন একটি নতুন বৈজ্ঞানিক ক্ষেত্র, যেখানে পরিবেশকে বিবেচনায় রেখে পানিসম্পদ নিয়ে গবেষণা করা হয়, কারণ পরিবেশগত ব্যবস্থায় উদ্ভিদের সাথে পানিসম্পদের গভীর সম্পর্ক রয়েছে। কোনো অঞ্চলে উদ্ভিদের উপস্থিতি বা অনুপস্থিতি পরিবেশগত পরিবর্তনের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তাই গণনামূলক ব্যবস্থার মাধ্যমে পূর্বাভাসমূলক মডেলিং গবেষণার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ, যাতে পানিসম্পদের একটি কার্যকর ব্যবস্থা গড়ে তোলা যায় এবং নির্ভরযোগ্য পূর্বাভাস দেওয়া সম্ভব হয়। অস্ট্রেলিয়া যেহেতু একটি অর্ধ-শুষ্ক অঞ্চল, তাই এই গবেষণা দেশটির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

হুযূর-এ-আনোয়ার (আল্লাহ তা'আলা তাঁর সহায় হোন)-এর সাথে ছাত্রীদের এই প্রোগ্রাম রাত আটটায় সমাপ্ত হয়।

মেলবোর্নের মুহাম্মদ আবদুল হক সাহেবের সাথে প্রতিশ্রুত মসীহ (আঃ)-এর সাক্ষাৎ এবং তাঁর সত্যতা গ্রহণ

মেলবোর্নের ভূমি এই গৌরবের অধিকারী যে, এই শহরে জন্মগ্রহণকারী একজন অস্ট্রেলিয়ান বাসিন্দা মি. চার্লস ফ্রান্সিস সিভরাইট (মকরম চার্লস ফ্রান্সিস সিভরাইট সাহেব) প্রতিশ্রুত মসীহ (আঃ)-এর দর্শন লাভের সৌভাগ্য অর্জন করেন এবং পরবর্তীতে তাঁর হাতে বাইআত করারও সম্মান লাভ করেন, ফলে তিনি সাহাবায়ে কেরামের অন্তর্ভুক্ত হন।

১৯০৩ সাল অস্ট্রেলিয়ায় জামা'আতে আহমদিয়ার ইতিহাসে বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। কারণ এই বছরেই প্রথমবারের মতো প্রতিশ্রুত মসীহ (আঃ)-এর বার্তা অস্ট্রেলিয়ায় পৌঁছে এবং এক সৌভাগ্যবান আত্মা, হযরত সুফি হাসান মুসা খান

মহান আল্লাহ্‌র বাণী

হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা সুদ খাইও না যাহা (ধন-সম্পদ ও অনিষ্টকে) বহুগুণে বৃদ্ধি করে এবং আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর যেন তোমরা সফলকাম হইতে পার। (আলে ইমরান: ১৩১)

দোয়াপ্রার্থী: Azizur Rahaman Sb, Lalbag, Murshidabad

সাহেব (রা), তা গ্রহণ করার তৌফিক লাভ করেন। একই বছরে একজন অস্ট্রেলিয়ান বাসিন্দা কাদিয়ানে প্রতিশ্রুত মসীহ (আঃ)-এর সাথে সাক্ষাৎ করার সুযোগ পান। এই অস্ট্রেলিয়ান মি. চার্লস ফ্রান্সিস ১৮৯৬ সালে ইসলাম গ্রহণ করার পর নিজের নাম "মুহাম্মদ আবদুল হক" রাখেন। তিনি ১৯০৬ সালে প্রতিশ্রুত মসীহ (আঃ)-এর হাতে বাইআত করে জামা'আতে আহমদিয়ায় অন্তর্ভুক্ত হন।

তিনি ১৮৬২ সালে মেলবোর্নে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একটি ক্যাথলিক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কয়েক বছর "ব্রিটিশ অ্যান্ড ইন্ডিয়ান এম্পায়ার লীগ-এর প্রতিনিধি হিসেবে ভারত ভ্রমণ করেন। এই ধরনের এক সফরের সময় অক্টোবর ১৯০৩ সালে তিনি কাদিয়ানে প্রতিশ্রুত মসীহ (আঃ)-এর সাথে সাক্ষাৎ করেন। এই সফরের সময় তিনি লাহোরে ছিলেন এবং এমন একজন সত্যনিষ্ঠ মুসলমানের সন্ধানে ছিলেন, যিনি ইসলামের জীবন্ত প্রতিচ্ছবি, যাতে তাঁর সান্নিধ্যের বরকতে তিনিও আত্মিকভাবে উন্নত হতে পারেন। এই অনুসন্ধানের সময় লাহোরে তাঁর সাক্ষাৎ হয় হযরত মিয়াঁ মিরাজউদ্দীন উমর সাহেব এবং তৈয়্যব নূর মুহাম্মদ আহমদী সাহেবের সাথে, যারা তাঁকে কাদিয়ানে যাওয়ার পরামর্শ দেন। ফলে তিনি ২২ অক্টোবর ১৯০৩ সালে কাদিয়ানে পৌঁছান, যেখানে তাঁকে আন্তরিকভাবে স্বাগত জানানো হয়। তিনি কাদিয়ানে দুই দিন অবস্থান করেন, যেখানে তিনি হযরত মাওলভী নূরউদ্দীন সাহেব (রা)-এর কুরআন শরীফের দারস থেকে উপকৃত হন এবং প্রতিশ্রুত মসীহ (আঃ)-এর সাথে সাক্ষাৎ করে কিছু প্রশ্ন করেন, যার বিস্তারিত 'মালফুযাত', খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৪৪৫, সংস্করণ ২০০৩, রাবওয়া থেকে প্রকাশিত গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে।

প্রতিশ্রুত মসীহ (আঃ) এবং মুহাম্মদ আবদুল হক সাহেব (রা)-এর মধ্যে যে আলোচনা হয়েছিল, তার সংক্ষিপ্তসার নিম্নরূপ:

আত্মিক সম্পর্ক সম্পর্কে মুহাম্মদ আবদুল হক সাহেব (রা)-এর প্রশ্নের উত্তরে প্রতিশ্রুত মসীহ (আঃ) বলেন: ইসলামের শিক্ষানুযায়ী আত্মিক পথ কেবল দোয়া এবং মনোযোগের মাধ্যমে অর্জিত হয়। তবে এর থেকে উপকৃত হতে সময় লাগে, কারণ পারস্পরিক সম্পর্ক দৃঢ় না হওয়া এবং হৃদয়ের ভালোবাসার বন্ধন প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত এর প্রভাব অনুভূত হয় না। হেদায়েতের পথ হলো দোয়া এবং মনোযোগ। শুধুমাত্র বাহ্যিক কথা ও শব্দ দ্বারা কিছুই অর্জন করা যায় না।

মুহাম্মদ আবদুল হক সাহেব (রা) প্রকাশ করেন যে তাঁর স্বভাব এমন যে তিনি আত্মিক ঐক্যের প্রতি আকৃষ্ট; তিনি এর জন্য তৃষ্ণার্ত এবং এতে পরিপূর্ণ হতে চান। তিনি বলেন, কাদিয়ানে প্রবেশ করার পর থেকেই তাঁর হৃদয় প্রশান্তি লাভ করেছে এবং যাদের সাথেই তিনি সাক্ষাৎ করেছেন, তাঁর মনে হয়েছে যেন তাদের সাথে তাঁর দীর্ঘদিনের পরিচয় রয়েছে।

প্রতিশ্রুত মসীহ (আঃ) বলেন, এটি আল্লাহর প্রতিষ্ঠিত প্রাকৃতিক নিয়ম যে প্রতিটি আত্মা একটি উপযুক্ত রূপের সন্ধান করে। যখন সেই রূপ প্রস্তুত হয়, তখন তাতে আত্মা নিজে থেকেই প্রবেশ করে। আপনার জন্য প্রয়োজন যে, আল্লাহ তা'আলা আমার উপর যে সত্যসমূহ প্রকাশ করেছেন, তা ধীরে ধীরে উপলব্ধি করুন। লক্ষ্য করুন, এক সময় ছিল যখন হযরত মুহাম্মদ (সা) একাকী ছিলেন, তবুও মানুষ সত্যিকারের তাকওয়ার দিকে আকৃষ্ট হতো; অথচ এখন হাজার হাজার আলেম ও বক্তা রয়েছে, কিন্তু তারা সততা ও আধ্যাত্মিকতার অভাবে সেই প্রভাব সৃষ্টি করতে পারে না। মানুষের অন্তরে যে বিষাক্ত উপাদান থাকে, তা কেবল বাহ্যিক কথাবার্তা দ্বারা দূর হয় না; এর জন্য নেককারদের সান্নিধ্য এবং তাদের আধ্যাত্মিক দৃষ্টি প্রয়োজন। তাই আধ্যাত্মিক ফয়েজ লাভের জন্য তাদের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া এবং আল্লাহ যেসব সঠিক বিশ্বাস তাদের শিখিয়েছেন তা বোঝা অত্যন্ত জরুরি।

তিনি আরও বলেন: মনে রাখবেন, আল্লাহর নিয়ম অনুযায়ী দুটি বিষয় থাকলে মানুষ আধ্যাত্মিক ফয়েজ অর্জনে সফল হয়। প্রথমত, নেককারদের সঙ্গ লাভ করে সময় ব্যয় করা এবং তাদের বক্তব্য শোনা। দ্বিতীয়ত, বক্তব্য বা লেখার সময় যদি কোনো সন্দেহ বা দ্বিধা সৃষ্টি হয়, তবে তা গোপন না রেখে সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশ করা, যাতে তাৎক্ষণিকভাবে তার সমাধান করা যায়।

মুহাম্মদ আবদুল হক সাহেব (রা) বলেন যে, এই জামা'আতে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য যে শর্তসমূহ প্রতিশ্রুত মসীহ (আঃ) বর্ণনা করেছেন, সেগুলো প্রকৃতপক্ষে ইসলামেরই শর্ত। যে ব্যক্তি মুসলমান হবে, তার জন্য এসব বিষয়ে আমল করা অপরিহার্য।

প্রতিশ্রুত মসীহ (আঃ) বলেন: আমাদের মূলনীতির একটি হলো আমরা সরল জীবনযাপন করি এবং ইউরোপ আজকাল জীবনের অপরিহার্য অংশ হিসেবে যে সব আড়ম্বর গ্রহণ করেছে, তা আমাদের সভা থেকে দূরে। আমরা রীতি-নীতি ও প্রথার বাধ্য নই, তবে এতটুকু মানি যে তা ত্যাগ করলে যদি কোনো কষ্ট বা পাপের আশঙ্কা থাকে। অন্যথায় খাদ্য, পানীয় এবং সামাজিক আচরণে আমরা সরলতাকে পছন্দ করি।

পরদিন প্রশ্নোত্তরের সময় মুহাম্মদ আবদুল হক সাহেব (রা), যিনি প্রথম খলিফার (রা) দারস শুনে এসেছিলেন, বলেন যে এ ধরনের (কুরআনের) অনুবাদের অত্যন্ত প্রয়োজন রয়েছে। অনেক মানুষ অন্যান্য অনুবাদ দ্বারা বিভ্রান্ত হয়েছে এবং তারা চান যে প্রতিশ্রুত মসীহ (আঃ)-এর পক্ষ থেকে একটি অনুবাদ প্রকাশিত হোক।

প্রতিশ্রুত মসীহ (আঃ) বলেন যে তিনিও নিজে কুরআন শরীফের একটি অনুবাদ প্রকাশ করার ইচ্ছা পোষণ করেন। তিনি আরও বলেন যে কেবল অনুবাদ যথেষ্ট উপকারী নয়, যতক্ষণ না তার সাথে তাফসির থাকে। যেমন, "'গায়রিল মাগজুবি আলাইহিম ওয়ালায যাল্লিন" (সূরা ফাতিহা: ৭)-এর অর্থ কীভাবে বোঝা যাবে যে এটি ইহুদি ও খ্রিস্টানদের নির্দেশ করে, যদি তা ব্যাখ্যা না করা হয়? এবং মুসলমানদের এই দোয়া কেন শেখানো হয়েছে? এর উদ্দেশ্য হলো, যেমন ইহুদিরা হযরত ঈসা (আঃ)-কে অস্বীকার করে আল্লাহর ক্রোধ অর্জন করেছিল, তেমনি শেষ যুগে এই উম্মতও প্রতিশ্রুত মসীহ (আঃ)-কে অস্বীকার করে আল্লাহর ক্রোধ অর্জন করবে। তাই শুরু থেকেই ভবিষ্যদ্বাণীর মাধ্যমে তাদের সতর্ক করা হয়েছে, যাতে সৎ আত্মাগণ এই ক্রোধ থেকে রক্ষা পায়।

এরপর মুহাম্মদ আবদুল হক সাহেব (রা)-এর প্রশ্নের উত্তরে প্রতিশ্রুত মসীহ (আঃ) সূরা নিসা (৪:১৫৭)-এর "তারা তাকে হত্যা করেনি এবং ক্রুশবিদ্ধও করেনি" আয়াতের বাস্তবতা ব্যাখ্যা করেন এবং অন্যান্য প্রশ্নের উত্তর দেন।

শেষে নিজের ইচ্ছা প্রকাশ করে প্রতিশ্রুত মসীহ (আঃ) বলেন যে তাঁরা সর্বদা দোয়া করেন এবং তাঁদের দীর্ঘদিনের কামনা যে ইউরোপীয়দের মধ্যে কেউ এমন বেরিয়ে আসুক, যে এই জামা'আতের জন্য তার জীবনের একটি অংশ উৎসর্গ করবে। তবে এমন ব্যক্তির জন্য প্রয়োজন যে সে কিছু সময় সঙ্গ লাভ করে ধীরে ধীরে সব প্রয়োজনীয় বিষয় শিখে নেবে, যার মাধ্যমে ইসলামের উপর আরোপিত কলঙ্ক দূর করা সম্ভব হবে এবং শক্তিশালী ও জোরালো যুক্তিগুলো বুঝে নেবে, যার দ্বারা এই কাজ সম্পন্ন করা যায়। তারপর সে অন্যান্য দেশে গিয়ে এই দায়িত্ব পালন করতে পারবে। এই দায়িত্ব বহনের জন্য একটি পবিত্র ও শক্তিশালী আত্মার প্রয়োজন। যার মধ্যে এই গুণ থাকবে, সে অত্যন্ত উপকারী মানুষ হবে এবং আল্লাহর নিকট আকাশে একজন মহান ব্যক্তি হিসেবে গণ্য হবে।

কাদিয়ানে দুই দিন অবস্থান করার পর মুহাম্মদ আবদুল হক সাহেব (মি. সি. এফ. সিভরাইট) ভারত, সিঙ্গাপুর, ওয়েস্টার্ন অস্ট্রেলিয়া এবং সাউথ অস্ট্রেলিয়া হয়ে পুনরায় মেলবোর্নে ফিরে যান।

প্রতিশ্রুত মসীহ (আঃ)-এর সাথে সাক্ষাৎ করার পর যখন তিনি অস্ট্রেলিয়ায় ফিরে যান, তখন আড়াই বছরের গবেষণা ও দোয়ার পর আল্লাহ তা'আলা তাঁকে আহমদিয়ত অর্থাৎ প্রকৃত ইসলাম গ্রহণ করার তৌফিক দান করেন। তাঁর এই গ্রহণের ঘোষণা ১৯০৬ সালের এপ্রিল মাসে Review of Religions" পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

এর কিছু সময় পর তিনি আমেরিকায় স্থানান্তরিত হন এবং সাউথ ক্যালিফোর্নিয়ায় নিজ উদ্যোগে তাবলিগ করতে থাকেন। ১৯২০ সালে যখন হযরত মুফতি মুহাম্মদ সাদিক সাহেব (রা) একজন মুবাল্লিগ হিসেবে আমেরিকায় পৌঁছান, তখন তাঁর সাথে তাঁর নিয়মিত যোগাযোগ ছিল।

১৯২২ সালে জামা'আতে আহমদিয়া আমেরিকার পত্রিকা "ঞযব গঁংষরস ঝঁহ-ৎরংবচ-এর ৪র্থ সংখ্যায় তাঁর একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় এবং তাঁর ছবি-সহ তিনি নিজের আহমদী হওয়ার উল্লেখ করেন। ওই প্রবন্ধে প্রতিশ্রুত মসীহ (আঃ)-এর সাথে তাঁর সাক্ষাতের বিবরণ বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি লিখেন যে:

"আমার দূর প্রাচ্যে ভ্রমণের সময় আমাকে প্রতিশ্রুত মসীহ (আঃ)-এর সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছিল, কিন্তু কাদিয়ানে আমার সমস্ত সন্দেহ ও সংশয় দূর হয়ে যায় এবং এক অনন্য আত্মিক অনুভূতির মাধ্যমে আমি এই প্রমাণ লাভ করি যে প্রতিশ্রুত মসীহ সম্পর্কে যে ঐশী ভবিষ্যদ্বাণীগুলো করা হয়েছিল, তা তাঁর ব্যক্তিত্বে (হযরত মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আঃ)) পূর্ণতা লাভ করেছে। ১৯০৩ সালে কাদিয়ানে হযরত মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর সাথে আমার সাক্ষাৎ ইসলামের সত্যতার এক বিস্ময়কর প্রমাণ ছিল-যে সেই সত্তা সম্পর্কে তেরো শতাব্দী পূর্বে উচ্চারিত বাক্যসমূহ তাঁর মধ্যেই পূর্ণ হয়েছে। আমার জীবনের ভ্রমণসমূহে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন ঘটনার মধ্যে এর চেয়ে বিস্ময়কর কিছু আমি আর দেখিনি। যখন আমি কাদিয়ান নগরীতে তার মসীহের সামনে উপস্থিত ছিলাম, এবং অবশেষে যখন আমাকে তাঁর সামনে উপস্থিত করা হলো এবং আমাদের চোখে চোখ মিলল, তখন তিনি আমাকে দেখেই বুঝে গেলেন যে আমি সত্য ও বাস্তবতার অনুসন্ধানকারী; এবং তাঁকে দেখামাত্রই আমি বুঝে গেলাম যে তিনিই সেই ঐশী ব্যক্তি, যিনি এই যুগে মুমিনদের একত্রিত করার এবং বিশ্বে ইসলাম প্রচারের জন্য প্রেরিত হয়েছেন। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে এই সাক্ষাতের ব্যবস্থা আল্লাহ তা'আলাই আমার জন্য করেছিলেন, এবং তিনিই আমার দেহ ও আত্মার মধ্যে প্রতিশ্রুত মসীহ (আঃ)-এর প্রতি ভালোবাসা সঞ্চার করেছেন। অবশেষে কয়েক মাসের চিন্তা, গবেষণা ও দোয়ার পর ১৯০৬ সালের এপ্রিল মাসে আমি ঘোষণা করি যে আমি কাদিয়ানের জামা'আতে আহমদিয়ার একজন সদস্য, এবং এভাবে আমি ইসলামী শিক্ষার প্রচারের জন্য বিশ্বের সবচেয়ে সংগঠিত ও সক্রিয় মুহাম্মদান মিশনারি সংস্থার সাথে সম্পৃক্ত হই। এই ঘোষণা সুদূর প্রাচ্যের দেশ নিউজিল্যান্ড থেকে পাঠানো হয়েছিল।

উপরের যে কথাগুলো আমি লিখেছি, আমি হৃদয়ের গভীরতা থেকে সেগুলোর প্রতি বিশ্বাস রাখি। এবং আজ থেকে ১৯ বছর পূর্বে যখন আমি কাদিয়ানে আমার প্রভুকে বিদায় জানিয়েছিলাম, তখন থেকে আমি তাঁর সত্যতার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসী রয়েছি। হযরত মুফতি মুহাম্মদ সাদিক সাহেব (রা)-এর এখানে আগমনের পর আমি এই প্রবন্ধের মাধ্যমে আমার অঙ্গীকার নবায়ন করছি যে আমি জামা'আতে আহমদিয়ার সাথে সম্পৃক্ত আছি। পূর্বেও তাঁর আগমনের পর আমি তাঁকে সহযোগিতা করেছি এবং ভবিষ্যতেও ইসলামের প্রচারের প্রচেষ্টায় সহযোগিতা করে যাব।

শান্তির খোঁজে বিশ্ব

আমেরিকা, ইসরায়েল এবং ইরানের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর এক মাসেরও বেশি সময় অতিবাহিত হয়েছে। এই যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে ধারণা করা হয়েছিল যে কয়েক দিনের মধ্যেই এর নিষ্পত্তি হয়ে যাবে। কিন্তু রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞ ও বিশ্লেষকদের অনুমানের বিপরীতে এই সংঘাত শুধু দীর্ঘায়িতই হয়নি, বরং প্রাণহানি ও সম্পদের ক্ষতি ইসরায়েল ও ইরানের সীমা ছাড়িয়ে অঞ্চলের অন্যান্য উপসাগরীয় দেশগুলিতেও ছড়িয়ে পড়েছে। আরব দেশগুলো, ইসরায়েল ও ইরানের সঙ্গে সঙ্গে, প্রতি মুহূর্তে প্রাণ সংকটের মুখোমুখি হচ্ছে। এখন পর্যন্ত ইরান ইসরায়েল ও উপসাগরীয় দেশগুলোর হাজার হাজার সামরিক ও শিল্প স্থাপনায় হামলা চালিয়েছে, এবং এখন অন্যান্য এশীয় ও ইউরোপীয় দেশ–আমাদের নিজ দেশ ভারতসহ–তেল, গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধি এবং মুদ্রাস্ফীতির শিকার হচ্ছে।

হরমুজ প্রণালী এবং এখন লোহিত সাগরের সামুদ্রিক পথ ব্যাহত হওয়ার কারণে ব্যাপক অর্থনৈতিক ক্ষতি হচ্ছে, যার প্রভাব শুধু এশিয়াতেই নয়, ইউরোপের কিছু অংশেও পড়ছে। যদি এই যুদ্ধ দীর্ঘ সময় ধরে চলতে থাকে, তবে এটি বিশ্বযুদ্ধে পরিণত হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, এই সংঘাতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (AI) ব্যবহার এটিকে আরও বিপজ্জনক করে তুলতে পারে, যেখানে নৈতিক মূল্যবোধ বা মানবিক সহানুভূতির কোনো স্থান থাকবে না। যদিও যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের সাম্প্রতিক বক্তব্য থেকে বোঝা যাচ্ছে যে তিনি দুই থেকে তিন সপ্তাহের মধ্যে এই যুদ্ধ শেষ করার ইঙ্গিত দিচ্ছেন, তবুও তার পূর্ববর্তী বক্তব্যগুলোর প্রেক্ষিতে আন্তর্জাতিক মহল এ বিষয়ে কোনো চূড়ান্ত মতামত দিতে বিরত রয়েছে। এটি সৌভাগ্যের বিষয় যে ইরান ও যুক্তরাষ্ট্র আপাতত একটি অস্থায়ী যুদ্ধবিরতিতে (ceasefire) সম্মত হয়েছে, তবে এটি স্থায়ী থাকবে কি না তা নিশ্চিতভাবে বলা যাচ্ছে না, কারণ শুরু থেকেই এর ওপর নানা আশঙ্কা ঘনীভূত রয়েছে।

আহমদিয়া মুসলিম জামাতের ইমাম, হযরত মির্জা মাসরুর আহমদ (আল্লাহ তাঁর সহায় হোন), বহু বছর আগে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট, জার্মানির কোবলেনৎসে অবস্থিত সামরিক সদর দপ্তর, ওয়াশিংটন ডি.সি.–এর ক্যাপিটল হিল–এ কংগ্রেস ও সিনেট সদস্যদের সামনে, রাষ্ট্রদূতদের, হোয়াইট হাউস ও স্টেট ডিপার্টমেন্টের কর্মকর্তাদের এবং অন্যান্য চিন্তাবিদদের সামনে, তদ্রুপ ইউরোপীয় পার্লামেন্টসহ বিভিন্ন স্থানে বিশ্বযুদ্ধের সম্ভাব্য বিপদের বিষয়ে সতর্ক করে বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানিয়ে বক্তৃতা প্রদান করেছিলেন। তিনি ইসরায়েল, ইরান, যুক্তরাষ্ট্রসহ অন্যান্য দেশের রাষ্ট্রপ্রধানদের কাছেও চিন্তাশীল চিঠি লিখে এ বিষয়ে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। এই বক্তৃতা ও চিঠিগুলো আজও বিশ্বের মানুষকে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানাচ্ছে।

হযরত আমীরুল মু'মিনীন (আল্লাহ তাঁর সহায় হোন) চৌদ্দ বছর আগে, ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০১২ তারিখে, ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী মি. বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুকে একটি সহানুভূতিপূর্ণ চিঠি লিখেছিলেন।

তিনি লিখেছিলেন:

"বর্তমানে আমরা এ ধরনের খবর শুনছি যে আপনি ইরানের ওপর আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছেন। বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহ পরিণতি আপনার চোখের সামনে থাকা সত্ত্বেও–যেখানে পূর্ববর্তী বিশ্বযুদ্ধে লক্ষ লক্ষ মানুষের সঙ্গে শত–সহস্র ইহুদিও প্রাণ হারিয়েছিল–আপনার দেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে আপনার দায়িত্ব হলো আপনার জনগণের জীবন রক্ষা করা। বর্তমান বিশ্বপরিস্থিতি স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত দিচ্ছে যে পরবর্তী বিশ্বযুদ্ধ কেবল দুটি দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না; বরং বিভিন্ন দেশের জোট গঠিত হবে। বিশ্বযুদ্ধের আশঙ্কা অত্যন্ত গুরুতরভাবে সামনে আসছে, যা মুসলিম, খ্রিস্টান ও ইহুদি–সবার জীবনকে ঝুঁকির মুখে ফেলবে। আল্লাহ না করুন, যদি এমন যুদ্ধ শুরু হয়, তবে তা মানবজাতির জন্য ধারাবাহিক ধ্বংস ডেকে আনবে এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্ম এর শিকার হবে, যারা পঙ্গু বা প্রতিবন্ধী হয়ে জন্ম নিতে পারে। এর কারণ হলো, পরবর্তী যুদ্ধে পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহার করা হবে।"

"আমি আপনাকে অনুরোধ করছি যে মানবজাতিকে যুদ্ধের কিনারায় ঠেলে দেওয়ার পরিবর্তে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা করুন যেন মানবতা বৈশ্বিক ধ্বংস থেকে রক্ষা পায়। পারস্পরিক বিরোধ শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে সমাধান করার বদলে সংলাপ ও আলোচনার পথ গ্রহণ করুন, যাতে আমরা আমাদের আগামী প্রজন্মকে একটি উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ দিতে পারি, তাদের জন্য প্রতিবন্ধকতার উত্তরাধিকার রেখে না যাই।" (হুজুরের ইংরেজি পত্রের উর্দু অনুবাদ, সূত্র: "বিশ্ব সংকট ও শান্তির পথ, পৃষ্ঠা ১৬০)

এভাবেই ঐ সময়ে হুজুরে আনওয়ার ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের রাষ্ট্রপতির কাছেও একটি পত্র লিখেছিলেন, যার কিছু অংশ নিচে উপস্থাপন করা হলো:

"বিশ্বশান্তির ওপর বর্তমান যে হুমকিগুলো বিরাজ করছে, তা আমাকে আপনাকে এই পত্র লেখার জন্য বাধ্য করেছে। ইরানের প্রধান হিসেবে আপনি এমন সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা রাখেন, যা কেবল আপনার দেশের ভবিষ্যৎকেই প্রভাবিত করবে না, বরং সমগ্র বিশ্বের জন্যও গুরুত্বপূর্ণ হবে। আজ সর্বত্র উদ্বেগ ও অস্থিরতা ছড়িয়ে পড়েছে। বিশ্বের কিছু অঞ্চলে ইতোমধ্যেই ক্ষুদ্র পরিসরে যুদ্ধ শুরু হয়েছে, আর অন্য কিছু স্থানে বিশ্বশক্তিগুলো শান্তি প্রতিষ্ঠার অজুহাতে হস্তক্ষেপ করছে। আজ পৃথিবীর প্রতিটি দেশ হয় অন্য কোনো দেশের বিরুদ্ধে শত্রুতা গড়ে তুলছে, নয়তো অন্য কোনো দেশের পক্ষ নিচ্ছে; কিন্তু ন্যায়বিচারের মৌলিক চাহিদা পূরণের দিকে কেউই মনোযোগ দিচ্ছে না। বৈশ্বিক পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে অত্যন্ত দুঃখের সাথে বলতে হচ্ছে যে আরেকটি বিশ্বযুদ্ধের ভিত্তি ইতোমধ্যেই স্থাপিত হয়ে গেছে।

এ বিষয়টি সর্বজনবিদিত যে বিশ্বের বহু ছোট–বড় দেশ পারমাণবিক অস্ত্রে সজ্জিত, এবং একই সাথে তারা একে অপরের প্রতি তীব্র বিদ্বেষ, শত্রুতা ও ঘৃণা পোষণ করছে। এমন কঠিন পরিস্থিতিতে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঘনিয়ে আসা মেঘ স্পষ্টভাবে দৃশ্যমান। পারমাণবিক অস্ত্রের এই বিপুল উপস্থিতি স্পষ্ট করে দেয় যে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ হবে একটি পারমাণবিক যুদ্ধ। এর ফলে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞের পাশাপাশি এর তিক্ত ফলাফল ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মধ্যে প্রতিবন্ধকতা বা বিকলাঙ্গতার রূপে প্রকাশ পাবে।

আমার বিশ্বাস, শান্তির দূত এবং সমগ্র মানবজাতির জন্য রহমত হযরত নবী করীম মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)–এর উম্মত হিসেবে আমরা কখনোই এমন ধ্বংসযজ্ঞ সহ্য করতে পারি না এবং করা উচিতও নয়। সুতরাং আমি ইরানকে অনুরোধ করছি যে তারা তাদের বৈশ্বিক গুরুত্ব উপলব্ধি করে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের সম্ভাবনা কমাতে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করুক।

আমি স্বীকার করি যে ইসরাইল প্রায়ই তার সীমা লঙ্ঘন করে এবং তার দৃষ্টি ইরানের দিকে নিবদ্ধ। প্রকৃতপক্ষে, যদি কোনো দেশ আপনার বিরুদ্ধে আগ্রাসী আক্রমণ চালায়, তবে আত্মরক্ষার পূর্ণ অধিকার আপনার রয়েছে। তবে যতদূর সম্ভব, বিরোধপূর্ণ বিষয়গুলো সমাধানের জন্য পারস্পরিক বোঝাপড়া ও আলোচনার পথ গ্রহণ করাই অধিক নিরাপদ। আমি বিনীতভাবে অনুরোধ করছি যে শক্তি প্রয়োগের পরিবর্তে আলোচনার মাধ্যমে মতভেদ দূর করুন।

আমি আল্লাহ্‌র সেই মনোনীত বান্দার অনুসারী হিসেবে আপনার কাছে আবেদন করছি, যিনি এই যুগে হযরত নবী করীম মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)–এর প্রকৃত অনুসারী হিসেবে প্রেরিত হয়েছেন এবং যিনি নিজেকে প্রতিশ্রুত মসীহ ও ইমাম মাহদী বলে ঘোষণা করেছেন। তাঁর আগমনের উদ্দেশ্যই হলো মানবজাতিকে তাদের সৃষ্টিকর্তার সঙ্গে যুক্ত করা এবং নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)–এর শিক্ষার আলোকে মানুষের মধ্যে ন্যায় ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা করা।

আল্লাহ্ তাআলা মুসলিম উম্মাহকে এই সুন্দর শিক্ষা বোঝার তৌফিক দান করুন।" ("বিশ্ব সংকট ও শান্তির পথ, পৃষ্ঠা ১৬৭–১৬৯)

হুজুরে আনওয়ার ৮ মার্চ ২০১২ তারিখে যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির কাছেও একটি পত্র লিখেছিলেন, যার কিছু অংশ নিচে উপস্থাপন করা হলো। তিনি লিখেন:

"বিশ্বে ক্রমবর্ধমান উদ্বেগজনক পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে আমি প্রয়োজন মনে করেছি আপনাকে এই পত্র লিখতে, কারণ আপনি যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির পদে অধিষ্ঠিত এবং এটি এমন একটি দেশ যা সর্ববৃহৎ পরাশক্তি। এই কারণে আপনার এমন সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা রয়েছে, যা কেবল আপনার জাতির ভবিষ্যতের ওপরই নয়, বরং বৈশ্বিক স্তরেও প্রভাব ফেলে।

আমি আপনার কাছে, বরং সকল বিশ্বনেতা ও প্রভাবশালী ব্যক্তিদের কাছে এই আবেদন জানাই যে অন্য জাতিগুলোকে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য শক্তি প্রয়োগের পরিবর্তে কূটনীতি, রাজনৈতিক প্রজ্ঞা এবং বিচক্ষণতার আশ্রয় নিন। বড় বৈশ্বিক শক্তিগুলোর–যেমন যুক্তরাষ্ট্রের–উচিত বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য তাদের ভূমিকা পালন করা এবং ছোট দেশগুলোর ভুলকে অজুহাত বানিয়ে বিশ্বের শৃঙ্খলা নষ্ট না করা।

আমি বিনীতভাবে অনুরোধ করছি যে আপনি আপনার সমস্ত প্রচেষ্টা উৎসর্গ করুন, যাতে বড় ও ছোট শক্তিগুলোকে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগুন প্রজ্বলিত করা থেকে বিরত রাখা যায়। যদি আমরা শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টায় ব্যর্থ হই, তবে নিঃসন্দেহে এই যুদ্ধ শুধু এশিয়া ও ইউরোপের দরিদ্র দেশগুলোতে সীমাবদ্ধ থাকবে না; বরং আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম এর পরিণতি ভোগ করবে। যখন পারমাণবিক যুদ্ধের কারণে সারা বিশ্বে প্রতিবন্ধী বা বিকলাঙ্গ শিশু জন্ম নেবে, তখন ভবিষ্যৎ প্রজন্ম কখনোই তাদের পূর্বপুরুষদের ক্ষমা করবে না, যারা এমন ভয়াবহ বৈশ্বিক ধ্বংসের কারণ হয়েছিল। আল্লাহ্ তাআলা আপনাকে এবং সকল বিশ্বনেতাকে এই বার্তা উপলব্ধি করার তাওফিক দান করুন।"

("বিশ্ব সংকট ও শান্তির পথ, পৃষ্ঠা ১৭৫–১৭৭)

এই সময়গুলোতে প্রয়োজন যে হযরত আমীরুল মুমিনীন (আল্লাহ্ তাঁর সহায়ক হোন)–এর খুতবা ও পত্রসমূহ সর্বাধিকভাবে প্রচার করা হোক, যাতে বিশ্ব শান্তি ও নিরাপত্তার এই মহান আহ্বানে মনোযোগ দেয়। হুজুর প্রতি জুমার খুতবায় দোয়ার প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন; সুতরাং প্রয়োজন যে আমরা আহমদিরা নিয়মিতভাবে দোয়া করি এবং আল্লাহ্‌র স্মরণে মনোযোগ দিই, যাতে পৃথিবী থেকে ভয় ও অস্থিরতার পরিবেশ দূর হয় এবং শান্তি ও নিরাপত্তার মনোরম বাতাস প্রবাহিত হতে শুরু করে।

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2026 -2028 Vol-11 Thursday, 30 Apr 2026 Issue No.18

Act.
MANAGER
ATHAR AHMAD SHAMIM
Mob: +91 9815639670
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs. 600/- (Per Issue : Rs. 12/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

ভারতের আহমদিয়া জামাতসমূহে রমজানুল মোবারকের দিন-রাত

নিম্নোক্ত জামাতগুলো থেকে রমজানুল মোবারক এবং ঈদুল ফিতর সম্পর্কে প্রতিবেদন পাওয়া গেছে।

এসব জামাতে তারাবিহ নামাজ, দারসুল কুরআন এবং গরিবদের মাঝে ফিতরা বিতরণের কর্মসূচি আয়োজন করা হয়েছে।

জামাতগুলোতে দারসে হাদিস এবং হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর মালফুযাত পাঠের ব্যবস্থাও করা হয়। এছাড়া কিছু ব্যক্তি সুন্নতে নববী (সা.) অনুসরণে মসজিদে ইতিকাফ পালন করেন এবং শাওয়ালের চাঁদ দেখা গেলে ঈদুল ফিতর উদযাপন করা হয়।

আল্লাহ্ তাআলা যেন এই সমস্ত জামাতের এই আধ্যাত্মিক কর্মসূচিগুলো কবুল করেন এবং তাঁর অনুগ্রহে তাদেরকে রমজানের বরকত থেকে উপকৃত করেন। আমীন।

জামাতগুলোর নাম নিম্নরূপঃ

১) জামাত আহমদিয়া কেরং, জেলা খোরদা (উড়িশ্যা)
২) জামাত আহমদিয়া ভরতপুর (পশ্চিমবঙ্গ)
৩) জামাত আহমদিয়া চিন্তা কুন্টা (তেলেঙ্গানা)
৪) জামাত আহমদিয়া ভদ্রক (ওড়িশ্যা)
৫) জামাত আহমদিয়া ত্রিশূর (কেরালা)
৬) জেলা বিজয়নগর, বেল্লারি (কর্ণাটক)
৭) জেলা আলিপুরদুয়ার (পশ্চিমবঙ্গ)
৮) তারাকোট (ওড়িশা)
৯) জামাত আহমদিয়া পংকাল (ওড়িশা)

(সম্পাদকীয়)

ভারতের বিভিন্ন জামাতে মসীহ মওউদ (আ.) দিবস উপলক্ষে জলসার আয়োজন

নিম্নোক্ত জামাতগুলোতে ২৩ মার্চ ২০২৬ তারিখে মসীহ মওউদ (আ.) দিবস উপলক্ষে জলসার আয়োজন করা হয়। এ দিনে জামাতসমূহে তাহাজ্জুদ নামাজ আদায় করা হয় এবং মসজিদ ও নামাজ সেন্টারগুলোতে সভার আয়োজন করা হয়। কিছু জামাতে খুদ্দাম ও আতফালদের জন্য আকর্ষণীয় প্রতিযোগিতারও আয়োজন করা হয় এবং পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

১) জামাত আহমদিয়া জেলা বিজয়নগর (কর্ণাটক)
২) জামাত আহমদিয়া তারা কোট (ওড়িশা)
৩) মাহমুদাবাদ (ওড়িশা)
৪) শেরপুর (মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ)
৫) চিন্তা কুন্টা (তেলেঙ্গানা)
৬) পংকাল (ওড়িশা)
৭) শ্রীপার (ওড়িশা)
৮) খাজুরি পাড়া (ওড়িশা)
৯) দেবদুর্গ (কর্ণাটক)
১০) ভরতপুর (বাংলা)
১১) জেলা আলিপুরদুয়ার (পশ্চিমবঙ্গ)
১২) জেলা চেন্নাই

এই জলসাগুলোতে বিশেষভাবে বায়'আতের শর্তাবলি এবং একজন আহমদির দায়িত্ব সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়। (সম্পাদকীয়)

মজলিস আনসারুল্লাহ ভারত-এর বার্ষিক ইজতেমার অনুমোদন

সাইয়্যেদনা হুজুরে আনওয়ার (আই.) মজলিস আনসারুল্লাহ ভারত-এর বার্ষিক ইজতেমার জন্য এ বছর ২৩, ২৪ ও ২৫ অক্টোবর ২০২৬ (শুক্রবার, শনিবার ও রবিবার) তারিখসমূহ অনুমোদন করেছেন।

জামাতের সদস্যবৃন্দ যেন দোয়ার সাথে এই ইজতেমাগুলোতে অংশগ্রহণ করে এর থেকে উপকৃত হওয়ার সর্বোচ্চ চেষ্টা করেন। একইভাবে, এই ইজতেমা যেন সর্বদিক থেকে সফল ও বরকতময় হয়-এর জন্যও নিয়মিত দোয়া অব্যাহত রাখুন। জাযাকুমুল্লাহু তা'আলা আহসানাল জাযা।

(সদর , মজলিস আনসারুল্লাহ ভারত)

মজলিস খুদ্দামুল আহমদীয়া ও আতফালুল আহমদীয়া ভারত-এর বার্ষিক ইজতেমার অনুমোদন

সাইয়্যেদনা হুজুরে আনওয়ার (আই.) মজলিস খুদ্দামুল আহমদীয়া ও আতফালুল আহমদীয়া ভারত-এর বার্ষিক ইজতেমার জন্য এ বছর ২৩, ২৪ ও ২৫ অক্টোবর ২০২৬ (শুক্রবার, শনিবার ও রবিবার) তারিখসমূহ অনুমোদন করেছেন।

জামাতের সদস্যবৃন্দ যেন দোয়ার সাথে এই ইজতেমাগুলোতে অংশগ্রহণ করে এর থেকে উপকৃত হওয়ার সর্বোচ্চ চেষ্টা করেন। একইভাবে, এই ইজতেমা যেন সর্বদিক থেকে সফল ও বরকতময় হয়-এর জন্যও নিয়মিত দোয়া অব্যাহত রাখুন। জাযাকুমুল্লাহু তা'আলা আহসানাল জাযা।

(সদর, মজলিস খুদ্দামুল আহমদীয়া ভারত)

মজলিস লাজনা ইমাউল্লাহ ও নাসেরাতুল আহমদীয়া ভারত-এর বার্ষিক ইজতেমার অনুমোদন

সাইয়্যেদনা হুজুরে আনওয়ার (আই.) মজলিস লাজনা ইমাউল্লাহ্ ও নাসেরাতুল আহমদীয়া ভারত-এর বার্ষিক ইজতেমার জন্য এ বছর ২৩, ২৪ ও ২৫ অক্টোবর ২০২৬ (শুক্রবার, শনিবার ও রবিবার) তারিখসমূহ অনুমোদন করেছেন।

জামাতের সদস্যবৃন্দ যেন দোয়ার সাথে এই ইজতেমাগুলোতে অংশগ্রহণ করে এর থেকে উপকৃত হওয়ার সর্বোচ্চ চেষ্টা করেন। একইভাবে, এই ইজতেমা যেন সর্বদিক থেকে সফল ও বরকতময় হয়-এর জন্যও নিয়মিত দোয়া অব্যাহত রাখুন। জাযাকুমুল্লাহু তা'আলা আহসানাল জাযা।

(সদর, মজলিস লাজনা ইমাউল্লাহ্ ভারত)

১৩১ তম বাৎসরিক জলসা কাদিয়ান

সৈয়্যেদনা হযরত আমীরুল মু'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আইঃ) ২০২৬ সালের জলসা সালানা কাদিয়ানের জন্য অনুমতি প্রদান করেছেন। জলসার দিনগুলি হল ২৫, ২৬ ও ২৭ শে ডিসেম্বর ২০২৪ (শুক্র, শনি ও রবিবার)। জামাতের সদস্যগণ এখন থেকেই দোয়ার সাথে এই মোবারক জলসায় অংশ গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে প্রস্তুতি আরম্ভ করে দিন। আল্লাহ্তা'লা আমাদের সকলকে এই ঐশী জলসা থেকে কল্যাণ মণ্ডিত হওয়ার তৌফিক দান করুন। এই জলসা সালানার সার্বিক সফলতার ও বরকত মণ্ডিত হওয়ার জন্য এবং হেদায়েতের কারণ হওয়ার জন্য দোয়ায় রত থাকুন। জাযাকুমুল্লাহ্ ওয়া আহ্সানুল জাযা।

(নাজির ইসলাহ ও ইরশাদ মারকাজিয়া, কাদিয়ান)

মহান আল্লাহ্র বাণী

হে খোদার বান্দাগণ! নিজেদের হৃদয়কে নির্মল কর ও অন্তরকে ধুয়ে ফেল। তোমরা কপটতা ও দ্বৈততা (দু'মুখী স্বভাব)- এর দ্বারা সবাইকে রাজী করতে পার কিন্তু এ স্বভাবের দ্বারা তোমরা খোদার ক্রোধকে উত্তেজিত করবে।

(রাযে হাকীকাত, পৃ: ১০)

দোয়াপ্রার্থী: Late-Azima Khatun
From: Mirza Enayetulla Sb, Harhari, Murshidabad

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir